দর্পন

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

কলকাতা ভারতীয় সাংবাদিকতার জন্মভূমি, অথচ....

হিকি সাহেবের গেজেটেই হোক বা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাঙ্গাল গেজেটিই হোক, ইংরেজী ভাষায় কিংবা দেশীয় ভাষায় ভারতীয় সাংবাদিকতার জন্মভূমি এই কলকাতা। সৎ নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও কলকাতার সংবাদপত্রের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। অথচ এই মহানগরীর উন্নয়নের দুরূহ এবং জটিল সমস্যা ও উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার বদলে কিছু বাজার চলতি অসত্য অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়েই অনেকে দায়মুক্ত হয়ে যান, কিন্তু এখন সবারই বোঝা উচিত—কলকাতার উন্নয়নের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং দুর্গম এবং বন্ধুর। কয়েক শতাব্দী ধরে স্বতোস্ফূর্ত বিশৃঙ্খলার এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা এই শহরকে আধুনিক বিশ্বের পরিকল্পিত নগরীগুলির আদলে নতুন করে সাজানোর কাজ মোটেই সহজ নয়, তা ছাড়া দেশ বিভাগজনিত ধর্ষিত এক জনসংখ্যার বিপুল ভার প্রতিনিয়তই এই মহানগরীকে পিষে ফেলছে। এই অতীব জটিল পরিস্থিতিতেও আমরা অক্লান্ত নিষ্ঠায় কঠিন পরিশ্রমে নগরোন্নয়নের সার্বিক কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছি। আশা করবো, কলকাতার প্রতি শুভ ও বিবেচক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের কাজের জটিলতা ও সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করবেন এবং সকলের সমবেত প্রয়াসে যাতে কলকাতা উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হয়ে আমাদের এই প্রিয়তম নগরের যাত্রাপথ সুগম হয়, তার জন্যে জনমত তৈরী করবেন।

—কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

১৩৮৮'র নিবেদন

মোহন অপেরা'র

আনন্দময় রচিত শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক পালা

রামের বনবাস

(গুরুক উদ্ধার)

সত্য প্রকাশ দত্ত রচিত ঐতিহাসিক পালা

বিবি করুণাময়ী

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

পুরাণে পারদর্শী মহাধিনায়ক

মোহন চ্যাটার্জী

সঙ্গে আছেন পুরুষ চরিত্রে শক্তিমান নট

অসীমকুমার, নন্দদুলাল চ্যাটার্জী, শৈলেন ঘোষ, বিবেকরঞ্জন, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী, সব্যসাচী মুখার্জী, গৌর ভড় ও আরো অনেকে এবং

স্ত্রী চরিত্রে নায়িকাশ্রেষ্ঠা

মিতা চ্যাটার্জী ও

স্বপ্না সেন, শেফালী দে, সীমা বোস এবং আরো অনেকে।

তারা মা অপেরার

আনন্দময় রচিত ভক্তিমূলক পালা

রামকৃষ্ণ সারদামণি

ও

তারা মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে

নির্দেশনায় মহাধিনায়ক

মোহন চ্যাটার্জী

ও

আনন্দময়

অভিনয়ে বাংলার সাধক শিল্পী

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও

নট ও নাট্যকার

আনন্দময়

সঙ্গে আছেন পুরুষ চরিত্রে সুবিমল আদক, গোপাল দে, সুনীল সমাদ্দার, সমর ব্যানার্জী, কুমারেশ ব্যানার্জী ও আরো অনেকে এবং স্ত্রী চরিত্রে রূপবন্ধি

লতা দেশাই (ব্যানার্জী)

প্রতিভাময়ী বেলা দেবী ও আরো অনেকে।

যোগাযোগ করুন : জেঃ ম্যানেজার ও বুকিং ম্যানেজার

শংকর কোলে

৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬. দূরভাষ—৫৫-৫২১৩

দর্পণ

বিশেষ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৮

সূচীপত্র

দেশে দেশে নয়াবুর্জোয়া অভ্যুত্থান / প্রীপতি নন্দী

ভোটের রাজনীতি / নারায়ণ চৌধুরী

বিকৃতির সাহিত্য / সুপ্রিয় দত্ত

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা সমাজ : বিরোধ ও মিলনের সূত্র / প্রদীপ রায়

কেন্দ্রবিন্দু গান্ধী পার্টি-নেতৃত্ব ইত্যাদি / অশোক চট্টোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দর্শন / মিহির আচার্য

প্রসঙ্গ : সজনীকান্ত দাস / রণজিৎকুমার সেন

এসঙ্গে : বৈরতন্ত্রের লাঠি কাঁধে পুঁজিবাদের প্রহরী / বৈদ্যনাথ লাহা

নারীমুক্তি : সাহিত্যে চিন্তায় ও চেতনায় / রশীদ আল ফারুকী

ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে / রথেন বাগ

দুর্যোধন যেখানে দেবতা / সজল সেন

লাদাখ হিমালয় / অরুণ ঘোষ

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তার ভবিষ্যৎ : বাদলকৃষ্ণ সেন

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা / কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ / শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপটের ব্যাখ্যচিত্র / অমল চক্রবর্তী

পুজোর সময় উৎসবমুখর দিনগুলিতে আপনাদের আনন্দের কথা ভেবে আমাদের কিছু বিশেষ কর্তব্যের বোঝা নিতে হচ্ছে। কারণ আমাদের কর্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আপনাদের নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য।

অর্থাৎ পুজো উপলক্ষ্যে সংঘাত মানুষে মানুষে হয়নাশ। আর হকারদা রাস্তা উপচে পড়ে। আর সেই ভাঙে পাড়া দিয়ে দৈনন্দিন জ্বালা জমার পরিমাণটা বেড়ে যায়।

এছাড়াও আছে অধিক বিদ্যুতের চাহিদা, আরো অনেক ফল ও নাগরিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া। আছে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ তৈরি করবার জন্যে রাস্তা বা পার্কে খোঁড়াখুঁড়ি ও অবরোধের ব্যাপার। ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট মেরামতি করে নগর জীবনে যাতায়াতের পথ সুগম করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আপনাদের আনন্দের দিনগুলো আরও সুষ্ঠুভাবে কাটাতে নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক বেশীভাবে পুরসেবার দায়িত্ব বহন করতে হবে এর জন্য আমরা প্রস্তুত। আর এই সঙ্গে আমাদের একটা নিবেদনও রাখতে চাই। এই দিনগুলিতে সব কিছু কাজে বিভেদ বিদ্বেষ ভুলে আপনারা শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। এছাড়া পুরসভার দৈনন্দিন কাজে আপনাদের সক্রিয় সাহায্য আমাদের কাম্য।

P29654

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

চিনি শিল্পের বিকাশ, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে

ওয়েস্ট বেঙ্গল সুগার ইনডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট (৬ষ্ঠ তল)

কলিকাতা-৭০০০১৬, ফোন : ২৪-১৫৩৬

মিল : আহেরপুর, বীরভূম, ফোন : আহেরপুর ২৪ ও ২৮

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : বেলডাঙ্গা ৩২

দর্পণ
বিশেষ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৮

দেশে দেশে নয়াবুর্জোয়া অভ্যুত্থান

শ্রীপতি নন্দী

আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের পক্ষপুটে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া বর্তমানে দুই সুপরিচিত ধারায় সক্রিয়—এক, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও সহযোগী আধাসামন্ততান্ত্রিক নয়া-বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপ প্রতিক্রিয়া এবং দুই, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শোধনবাদী রাষ্ট্রীয় নয়া-পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়া।

এ যুগ হলো সে যুগ যখন দেশগুলি ও জাতিগুলি চায় স্বাধীনতা, জনগণ চায় মুক্তি, সর্বহারা চায় বিপ্লব। আবার, এ যুগ সে যুগ যখন সাম্রাজ্যবাদীরা সন্তর্পণে দেশগুলিতে নয়া-বুর্জোয়াদের যোগসাজসে নয়া-উপনিবেশবাদী ফাঁদ পেতেছে, আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে নয়া-পাতিবুর্জোয়া শোধনবাদীদের ঘাড়ে চড়ে সন্ত্রাসবাদী অভিযান চালিয়েছে। এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নয়া-বুর্জোয়া সে মু ক বা দ ও নয়া-পাতিবুর্জোয়া শোধনবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে অসংখ্য ঘাত-কৌশলের জাল বিছিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা গণমুক্তি ও বিপ্লবের শক্তিগুলিকে বিপথগামী করার চেষ্টায় রত রয়েছে নতুবা দানবীয় আক্রমণে ধ্বংস করতে চাইছে। এ অন্তত শক্তিগুলির প্রত্যেকেই সোভিয়েত মানব জাতির সাধারণ শত্রু, কিন্তু এদের প্রত্যেকেই আবার ঘরে-বাইরে অসংখ্য সঙ্কটে বিপন্ন, অতএব সাধারণভাবে তারসাম্যবিহীন। ইন্দোচীনে মার-খাওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনো ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ মাখছে। আফগানিস্তান মধ্যে ও কারমাল চক্রের দখল নিয়েছে, কাম্পুচিয়া কেড়ে নিয়েছে হানয়ের ও সামরিণ চক্রের; এরা বিশ্বের কাছে ধিকৃত, এদের পলায়নের পথ রুদ্ধ। পোলাণ্ডে পাদ্রীবাদের হস্তিতম্বি সত্ত্বেও বিশ্বাস মধ্যে কেবলমাত্র ঢোঁক গিলছে তাই নয়, খোদ রুশদেশে পাদ্রীবাদের অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় মধ্যে আতঙ্কিত। আর সে নয়াদিল্লী নিজেকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবী করে সে নিজেই জোট নিরপেক্ষ শিবিরে প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছে, তার আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কথা না হয় বাদ দেয়া গেল। বুর্জোয়া জগতের ঘরোয়ামহলে এ যুগে উপরোক্ত দৃশ্যগুলি খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবের এ একই যুগে সর্বহারার রাজনৈতিক প্রস্তুতি দুর্বল অবস্থায় থাকলে এ ঘাটের মড়াগুলিকে ঘাটে তুলে দেবে কে?

ভিলেন যখন নায়ক হয়

ইতিহাসের নায়ক যখন প্রস্তুত থাকে না, ইতিহাসের ভিলেনের হাতে তখন ছড়ি ওঠে। স্বভাবতই নয়াবুর্জোয়ারা ও শোধনবাদী দাদারাষ্ট্রেরা তাদের নিজ নিজ শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী খুঁটি ধরে থাকে। সুতরাং ক্লি এস্টারপ্রাইজের শিবির-বিলাসীগণ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদমুখী হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে একটেটিয়া পুঁজিবিরোধী পাতিবুর্জোয়া শোধনবাদীগণ রাষ্ট্রীয় পুঁজীবাদী অর্থাৎ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদমুখী হয়। অতএব, দেশে দেশে নয়াবুর্জোয়া পুঁজিবাদীদের ও শোধনবাদীদের কলাকৌশল বিভিন্ন, যদিও তাদের সাধারণ লক্ষ্য বিপ্লববিরোধিতা—অর্থাৎ নিজ নিজ দেশে সর্বহারার নেতৃত্বকে গড়ে উঠতে না দেয়া কিংবা সর্বহারার নেতৃত্বকে উৎখাত করা, এবং নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

এরূপ বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেমন একদিনে গড়ে ওঠেনি তেমনি প্রকৃত মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে এ ঘটনাগুলি কখনো অদৃষ্ট ছিল না। মনে ১৯৫৭ সালে বিশ্ব কমিউনিষ্ট সম্মেলনে মাও সে-তুঙের "East

Wind" আখ্যার তাৎপর্যটি প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন দেশের সর্বহারা নেতৃত্বের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে এবং ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদের কূট-কৌশলের সাহায্য নিয়ে যে নয়াবুর্জোয়া শ্রেণী 'জাতীয় নেতৃত্বের' একমাত্র দাবিদারী হয়ে উঠলো এবং অতিদ্রুত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে পেল (যেমন ভারতে) সে নয়াবুর্জোয়ারাই হোক, কিংবা নয়া ঔপনিবেশিক কনসেসন ব্যবস্থার এঁটোছিটে খেয়ে যারা দেহে মনে খানিকটা চমনে হয়ে উঠলো সে পাতিবুর্জোয়ারাই হোক, এরা কেউই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলতে রাজী ছিল না। আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালগণ যখন সঙ্কট-ত্রাসের জন্মী-কিস্তির ঘুষে বেহুঁশ ছিল এবং বিশ্বে কোথাও তালভাবে গুছিয়ে বসতেও পারেনি, সেদিন সাফল্যের পর সাফল্যের দুঃসাহসে ভর করে সমাজতান্ত্রিক শিবির বিশ্বে মুক্তি-চেতনার আলোড়ন এনে দিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের সপক্ষে আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তনের যে ঐতিহাসিকসুযোগগুলিকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বহারার নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার যে আশু প্রয়োজন ছিল, তা যথাযথ প্রত্যক্ষ করতে না পারাটাই ১৯৫৭ সালের বিশ্ব সম্মেলনের প্রধান ঐতিহাসিক ব্যর্থতা—এ সত্যটি পরবর্তীকালে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ, সেকালে সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণাত্মক অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিল, যেসে যেসে তাদের দালালরা ছেড়ে দিয়েছিল ঔপ দিয়েছিল, পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও শক্তি পুঁজিশিবিরের চাইতে অনেক গুণ বেশী ছিল। কিন্তু "West Wind"-কে একতরফা আসর ছেড়ে দেবার ফলে সমকালীন তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নয়াবুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নে হটিয়ে দিল, আর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নে তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশে নেতৃত্বের সঙ্কট প্রধান সঙ্কট হয়ে দেখা দিল—'ভিয়েন'রা নায়ক সেজে বসলো।

নয়া বুর্জোয়া দালালরাজ

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পরিকল্পনা ও ছক অনুযায়ী তাদের অনুসরণ ও সহযোগীতায় নয়াবুর্জোয়া শাসকগুলি বিশ শতাব্দীর সমস্ত অভিশাপকে এনে জড়ো করে সমস্ত প্রাণ-স্পন্দনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, সাধারণ মানুষের হক-বাসে-বন্ধাকে তলার-জেপো-কথল রূপে কেনাবেচা করে 'নিউ ইকনমিক অর্ডার' গড়ে তুলতে চায়। অনুন্নত বহু দেশে নয়া ঔপনিবেশিক নতুন ব্যবস্থার অন্তর্বিস্তর পতন ঘটেছে, পুরোনো সামাজিক বিন্যাসে কমবেশী পরিবর্তন এসেছে, বিদেশ-নির্ভর "স্বদেশী অর্থনীতি"র নামে দেশী বিদেশী শোষণ আখছার চলছে। 'অগ্রবর্তী' পুঁজিবাদী দেশ-গুলি থেকে পুঁজি ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করে অর্থাৎ নির্ভরশীল মূলধন ও নির্ভরশীল প্রযুক্তি বিস্তার জোরে নিতান্তই চির-পশ্চাৎবর্তী ও চির-নির্ভরশীল সমাজ গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে করে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যেমন কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার জোর পেলো তেমনি নতুন নতুন আন্তর্জাতিক বিস্তারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

মার্শাল্টাপলাল পুঁজি বিনিয়োগ, ডলারের ছেকার, ডলারের অবিমান ইত্যাদিকে বাদ দিলে বর্তমানে বহু প্রচারিত 'নিউ ইকনমিক অর্ডার' নামক অপূর্ব বস্তুটির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে না। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে ইদানীং কিছুকাল ধরে যে উত্তর দক্ষিণ আলোচনা ("North-South Dialogue") চলছে সেক্ষেত্রেও উত্তরের (উন্নত দেশের) উপর দক্ষিণের (অনুন্নত দেশের) মুখাপেক্ষিতার দিকটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। নয়া উপনিবেশবাদী সার্কাসের একাধারে জানোয়ার ও রাউন্ড রূপ নয়াবুর্জোয়া শাসকশক্তিগুলি জন্মলগ্নেই বিদেশ-নির্ভর এবং শ্রেণীচরিত্রে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষ, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীকে ফাঁকি দিয়ে আধাসামন্তবাদকে ভিত্তি করে এরাই নয়াবুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপের জন্ম দেয়, এরাই অতঃপর অসংখ্য আইনের চাবুক ও শোষণের 'সাকসন পাম্প' চালিয়ে জাতীয় জনগণ ও সর্বহারার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এরা প্রধানতঃ পশ্চিমমুখী।

সোভিয়েতী দালালরাজ

বিশ্ব প্রতিক্রিয়া শিবিরের দ্বিতীয় ধারাটি সোভিয়েত নেতৃত্বে পরিচালিত। যেসে যেসে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আবহাওয়াকে নয়া পাতিবুর্জোয়া শোষণবাদীরা কাজে লাগালো এবং বিভিন্ন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করলো। সোভিয়েত 'সোভিনিজম' এ অনুকূল পরিস্থিতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় সে সমস্ত যেসে দালালরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, 'সমাজ-তান্ত্রিক' আলখাল্লা পরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অনুন্নত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যকারী পীর সেজে বসলো, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আদলে নতুন ধরনের নয়া উপনিবেশবাদী ব্যবস্থা জন্ম নিল।

বিপ্লব বিরোধিতার প্রশ্নে নয়াবুর্জোয়ারা ও নয়াসোশনবাদীরা স্বভাবতই সমধর্মী। বিশেষরূপে লক্ষণীয়, ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে অবস্থান ছিল, আফগানিস্তান প্রশ্নে সোভিয়েতের আজ তা-ই। আবার একই ভিয়েতনামের ব্যাপারে সোভিয়েতের যে অবস্থান ছিল, আফগানিস্তান প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ তা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যে অভিযোগ ছিল, আজ মস্কোর বিরুদ্ধে ওয়াশিং-টনের অভিযোগ তার চাইতে তলতঃভাবে পৃথক কিছু নয়। পার্থক্য শুধু একটাই যে ভিয়েতনামের সমস্ত বিপ্লবে হো চি মিনের তথা সর্বহারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায়

ভিয়েতনাম বিপ্লব গণমতভাবে কম সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েনি, সর্বহারার নেতৃত্বে গণনির্ভর ছিল। অতঃপর হো চি মিনের মৃত্যুর পর রাশিয়া কায়-চক্রের সহায়তায় ধীরে ধীরে সোধনবাদী তথা দলপন্থী সরকার গঠন করে।

প্রসঙ্গক্রমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত 'ব্রেজনেভ ডক্‌ট্রিন' এসে পড়ে, প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হলো—(১) সীমিত ও চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব (Limited and Supreme Sovereignty), (২) আন্তর্জাতিক একনায়কত্ব (International Dictatorship) যার প্রকৃত অর্থ আন্তর্জাতিক কম একনায়কত্ব, (৩) সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায় (Socialist Community) বা কম-নিয়ন্ত্রিত 'সমাজতান্ত্রিক শিবির', (৪) আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন (International Division of Labour) বা শিল্পসমৃদ্ধ রাশিয়ার পরিপূরক রূপে কৃষিনির্ভর ও প্রসেসিং কারখানা রূপে তৃতীয় বিশ্বের পরিণতি।

এ সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে যদ্যপি যদি কর্তৃকারক হয়, তবে অন্যান্য দেশের সোধনবাদীরা সেক্ষেত্রে করণ কারক। বিভিন্ন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে এমন কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যে সমস্ত পাতিবুর্জোয়া ধারাগুলি মিলেমিশে থাকে, বিপ্লবের পর সর্বহারা নেতৃত্বে জাতীয় পুনর্গঠনের কালে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ও বিপ্লবের শক্তিগুলিকে সংহত করার প্রশ্নে তারাই আমলাতান্ত্রিক পথায় বিপ্লবের ভিত্তিকে দুর্বল করে রাখে এবং ক্রমে যথাসময়ে প্রকৃত অর্থে বিপ্লবের শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব এ পথেই কম রাষ্ট্রচরিত্রকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে এবং কিউবা ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া ও লাওসে এভাবেই বিপ্লবযাতকরা তৎপরতার সহিত আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সে সমস্ত দেশের গৌরবজনক বিপ্লবগুলিকে ও সর্বহারাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে (যেমন কাম্পুচিয়ার ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনামী আগ্রাসন ও থাইচুনী), এমন কি দূর দূরান্তের দেশগুলিতে (যেমন উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় তাড়াটে কিউবান সৈন্যের সরবরাহ) বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে এরা বিভেদ ও রক্তপাত চালিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই এদের নেতৃত্বে রয়েছেন এদেরই কুলচূড়ামণি সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ।

সোধনবাদীরা প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরোধী নয়, বরং বলা যায়, সাধারণভাবে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সব শেয়ালের এক রা। অতএব বিশ্বের সমস্ত সোধনবাদী বেকী বিপ্লবীরা ভিয়েতনাম লাওস কাম্বোডিয়া আফগানিস্তানের বর্তমান শাসকচক্রগুলি সম্পর্কে একইরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে। সর্বশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ কাম্বোডী সমাজতন্ত্রের নমুনাটি দেখা যাক: পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দুনিয়ার সোধনবাদী শিবির একযোগে এ কায়মাণী 'খেমারুজকে' 'মার্কসবাদী' আখ্যা দিয়ে দুনিয়ার মার্কসবাদী লেনিনবাদী আন্দোলনগুলির মুখে চুনকালি মাখাতে সচেষ্ট। লক্ষণীয়, আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত প্রায় এক লাখ সোভিয়েত সৈন্যের কোলে বসে 'প্রেসিডেন্ট' বায়বাক কায়মাল সেহেশে এক উদ্ভট 'খেমার সমাজতন্ত্র' রচনা করেছে। সুতরাং লক্ষ রক্ষকের খাইখোরাক ও মাহিনাপত্তর যোগাতে তথাকার জৌজান প্রদেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ পথ বেয়ে একেবারে 'বন্ধুর দেশে' চলে যায়। মজাটি এমন যে, চালান-যাওয়া গ্যাসের পরিমাণ যতটুকু আকগানিস্তানে অবস্থিত মস্ত, খোদ কম অঞ্চলে; মিটার রিডিং এর বিপাকিক কোন ব্যবস্থা নেই। চালানের পরিমাণ ভূক্তেই, কিন্তু মূল্য নির্বিঘ্ন। তবু সমস্ত মূল্য আকগানিস্তানের কপালে জোটে না—লক্ষ কমের খরচ বাবদ কম হিসাব অনুযায়ী সবটাই বরবাদ হয়ে যায়। কিন্তু এতেও অনেক সময়ে কুলায় না; অতএব 'উন্নয়ন সাহায্যে'র (সামরিক প্রয়োজনে রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদির) নামে মোটাতে কাপড়ার প্রদেশের বিপুল পরিমাণ আকরিক ইউরেনিয়াম ও সদ্য আবিষ্কৃত তৈলখনিগুলি উজাড় হচ্ছে। ইরাণ থেকে রাশিয়ায় তেল ও গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার যে বিপাক দেখা দেয়, আকগান গ্যাস-তেল সে কারণেই অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়াও এক কিউবিক মিটার আকগান গ্যাস ৭০-৭৫ ডলারে কিনে নিয়ে ৯০-১০০ ডলার মূল্যে পশ্চিম জার্মানীতে বেচে দেবার ব্যবস্থাদিও রাশিয়ার রয়েছে। সোভিয়েত সংবাদ বুলেটিন অনুযায়ী আকগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে আভ্যন্তরিক তামার পরিমাণটি রীতিমত বিশাল এবং বামিয়ান প্রদেশে খনিজ লোহা ও 'ইমারল্ড'-এর বহুত পৃথিবীতে বৃহত্তম। এভাবে দেশের মানুষকে ধনেপ্রাণে মেরে, ভিতেচাড়া দেশছাড়া করে কায়মাণী নয়াবুর্জোয়া 'বিপ্লব' এগিয়ে চলেছে। ভিয়েতনাম লাওস কাম্পুচিয়ার দৃশ্যগুলি কি অনুরূপ? আফগানার ছবিটিও কম বিচিত্র নয়। পতুগীজরা আফ্রিকা ছেড়ে যেতে না যেতেই কম প্রভাবিত তথাকার নেটো-নেতৃত্ব আফ্রিকার জাতীয় সংহতি ও সার্বভৌমত্বের সম্ভাবনাগুলিকে গোল্লায় পাঠিয়ে দিল, গোষ্ঠীগতভাবে গদী দখল করে নিয়ে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলো।

যাই হোক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ক্যাস্ট্রো, কাম, সামরিক, নেটো ও কায়মাল নেতৃত্বগুলি কম প্রভাবিত বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় শিবিরের অংশীদার, এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য, জোট নিরপেক্ষতার মৌলিক

সমর্থক হলেও কার্যতঃ এরা জোট নিরপেক্ষতার বিরোধী। অতএব, সোভিয়েৎ হাই তত্ত্বগত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীই নয়, দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের শত্রুদের দ্বিতীয় শিবির আন্তর্জাতিক শোষণবাদী প্রতিক্রিয়ার সংগঠন এবং পরিচালক।

ঘাটের মড়াকে ঘাটে তুলতে হবে

আজ সঙ্কট-নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার সমগ্র শিবিরে শাসক শ্রেণীগুলির অভ্যন্তরে যখন ফাটলের পর ফাটলের প্রক্রিয়া চলছে, যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে জনগণের অভিযান মোহমুক্তি ঘটছে, বিপ্লবপ্রতিকল্পের নানা আক্রমণের সত্ত্বেও জোটনিরপেক্ষতার জোয়ারের নিকট লগ্নপুঁজিবাদী শাসকশক্তিগুলি নতি স্বীকারে বাধ্য হচ্ছে, যখন বিপ্রতিক্রিয়ার উত্তর শিবির ধীরে ধীরে থকথকে মাটিতে পড়ছে, সে সময়ে কাম্পুচিয়া ও আফগানিস্থান প্রশ্নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে গৌরবজনক ভূমিকা নিয়েছিল তাতে বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার শিবিরগুলি নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের ধাক্কা খেলো। অবশ্য তারত সরকার আসলে যে কি তা যারা বোঝেন তারা উপরোক্ত সম্মেলনগুলিতে ভারতীয়দের ভূমিকা দেখে আশ্চর্যবোধ করবেন না। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার উত্তর শিবিরের প্রধান শক্তিগুলি যে দেশের অর্থনীতি রাজনীতি সামরিক ও বেসামরিক নীতির কলিজায় বসে ছিন্ন পাচ্ছে, এবং পূর্ব ইউরোপ সহ অন্ততঃ পঁচিশটি দেশের পুঁজি যে দেশে মুনাফা শিকার চালিয়ে যায়, সে ভারতের রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্বের বিচিত্রতম বস্তু হবে না কেন? প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার দীর্ঘকাল তৃতীয় বিশ্বে জাটল সঙ্কীর কাজে নিযুক্ত - কখনো রাশিনী হিসেবে কখনো বা মতোয় প্রীতার্থে।

তবে সাম্রাজ্যবাদীরা কিংবা তাদের ক্রীতদাস নিশ্চয়ই ইতিহাসের বাহক নয়, বিলেন যায়। অতএব, তারা যেরূপ চায় ঘটনার গতি সেরূপ চলে না। বিপ্লবের পরিস্থিতিতে যেমন বীর জনগণ জন্মায়, তেমনি বিশ্বাসঘাতকরাও দেখা দিয়ে থাকে। ইতিহাসের এ নির্মম সত্য আজো অম্লান, কিন্তু প্রশ্ন হলো বন্ধু ও শত্রুকে চিহ্নিত করা—বন্ধু শক্তিগুলির সঙ্গে বৈপ্লবিক সংহতি গড়ে তোলা, শত্রুদের আরো আরো বিচ্ছিন্ন করে রাখা। আর এ কাজের উপায় ও পদ্ধতি সর্বহারার নিকট অজানা নয়।

"The line is the keylink, once it is grasped, everything will fall into place"—Mao. আমার এ লাইন সম্পর্কীয় প্রশ্নে আমাদের অজস্র যদি আমাদের দুর্বলতার প্রধান দিক না হয়ে থাকে তাহলে সংগ্রামহীন সংগ্রামকে প্রাধান্যে থাকতে. ধরে অর্থনৈতিক চক্রবাল রেখার চিহ্নিত চত্বরে যারে যারে পাক খেয়ে আন্তপ্রতারণার পথই অবিলম্বে পরিহার করতে হবে। অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়—ঘরে বাইরে সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে ও সর্বহারার বিশ্ববিপ্লবের পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়া, প্রতিক্রিয়ার উত্তর শিবিরকে কোণঠাসা করে রাখা—নাড়ি পথ। বিশ্বে। আর ইতিহাসের দাবী অনুযায়ী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে তুলতে হবেই, তার গতিমুখগুলিকে আরো ধারালো ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ-নয়াবুর্জোয়াবিরোধী করে তুলতে হবে। মুক্তিকামী জনগণ ও জাতিগুলির মধ্যে ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতেই ঘাটের মড়া নয়াবুর্জোয়া পুঁজিবাদকে ঘাটে তোলা যাবে, শোধনবাদী 'পুনঃপ্রতিষ্ঠাবাদ'কে (Restoration) আমার ইতিহাসের ছাইগাদায় চাপা দেয়া যাবে।

ভোটের রাজনীতি

নারায়ণ চৌধুরী

স্বাধীনতার পর গত চৌত্রিশ বছরের ভারতীয় রাজনীতির গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে আমার এই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের রাস্তায় চলে এ দেশের আর কিছু হবার নয়। বরং এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য কোন রাস্তা ধরা যায় কিনা সে সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় হয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্র বলতেই বোঝায় নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই করে তাঁদের সাহায্যে দেশ শাসন। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এই নির্বাচন হওয়া নিয়ম আমাদের দেশে। একে বলা হয় সাধারণ নির্বাচন। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় স্তরেই একত্রালীন এই নির্বাচন হয়ে থাকে। কেন্দ্রের বেলায় লোকসভার নির্বাচন, রাজ্যগুলির বেলায় বিধানসভার নির্বাচন। স্বাধীন ভারতের অনুষঙ্গে ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর এ পর্যন্ত প্রথম নির্বাচন ধরে সাতটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছে—অন্তর্বর্তী নির্বাচনের হিসাব বাদ দিয়ে।

নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের নিরূপণ এবং নির্বাচন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের শাসনকার্য চালানো—শুনতে বেশ ভাল। আদর্শ হিসাবেও বেশ একটা চেকনাই আছে 'জনপ্রতিনিধিত্ব' কথাটির মধ্যে। দেশের সাধারণ প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি রূপে কিছু তথাকথিত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তাঁদের হয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির স্তরে উভয়ত্র দেশের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত আছেন—এর চেয়ে মনোহর চিত্র আর কী হতে পারে? অর্থাৎ কিনা 'গণতন্ত্র' কথাটার মধ্যেই ওই কী বলে এমন একটা জাদু আছে যে শোনামাত্র সকলে বশ হয়ে যায়, অন্য কোন যুক্তির আর প্রয়োজন করে না। গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় কিন্তু হয়েছে তো সাতগুণ মাপ, যেটা হলো সেটা সাপ কি ব্যাঙ তা দেখার দায় কারও নয়। গণতন্ত্র এমন একটি চোখ-ভুলানিয়া ও মন-ভুলানিয়া শব্দ যে, তার রঙচঙে আবরণের আড়ালে সব দোষ ঢাকা পড়ে যেতে বাধ্য। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে নির্বাচন যখন হয়েছে তখন আর কথা কী, তার কি কোন গলদ চোখে পড়তে আছে? হাজার গলদ বেরুলেও এক্ষেত্রে চোখ বুঁজে থাকাই নিয়ম। কেননা গণতন্ত্রের দোষ ধরা 'গুনাহ' বিশেষ, তাকে ক্ষমা করা যায় না।

নির্বাচনের প্রক্রিয়া

কিন্তু কী পদ্ধতিতে এদেশে নির্বাচন হয় তার তত্ত্ব সকলেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন বিশদ করে বোঝাবার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না। তবু এই নিয়েই যখন আলোচনা করতে বসেছি তখন প্রক্রিয়াটার কথা বলতেই হবে। সকলের জানা কথা পুনর্কথনের ঝুঁকি নিতে হবে।

অন্য দেশের কথা বলতে পারব না, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবে সাতটি ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভারতীয় নির্বাচন মানেই টাকার খেলা, দুর্নীতি, ভোট-ভাঙানো, প্রার্থী কেনা-বেচা, ভোটার কেনা-বেচা, গায়ের জোরে বুথ দখল, জাল ভোট দেওয়া, ভয় দেখিয়ে প্রকৃত ভোটদাতাকে ভোটকেন্দ্র থেকে ঘুরে যেতে বাধ্য করা এবং তাকে 'নিরাপদ' দূরত্বে আটকে রাখা, মারামারি, গুলোগুলি, নির্বাচন হয়ে যাবার পর নির্বাচন কমিশনের কাছে মিথ্যা হিসাব দাখিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরও কত রকমের কাণ্ড-কারখানা যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলে তার সব খবর আমরাই জানি না। বাইরের লোকের এগুলি জানবার কথাও নয় এজন্য নির্বাচন-যজ্ঞে অবতীর্ণ রাজনৈতিক দলগুলি, তাঁদের প্রার্থীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা—তাঁরাই শুধু সব ভিতরের কথা জানেন ও বলতে পারেন। এ সব কথা গোপনতার আড়াল ভেদ করে খুব কমই বাইরে প্রকাশিত হয়। নির্বাচন তো নয় যেন দুর্নীতিতে দুর্নীতিতে চারদিক ছয়লাপ।

এই যদি ভারতীয় নির্বাচনের চেহারা হয় তো দূর থেকে তাকে প্রণাম করি এবং প্রার্থনা জানাই, হে ভারতমাতা, তুমি তোমার সন্তানদের এই নিয়মিত পঞ্চবার্ষিকী দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই দাও এবং তাদের মঙ্গলের জন্য আর কোন পন্থার কথা চিন্তা কর। গণতন্ত্রের নামে এই আসুরিক লীলা অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার। নয়তো দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, তার আরও উচ্ছন্নে যাওয়া কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। রক্তে বিষক্রিয়ার মত নির্বাচনী দুর্নীতি শুধু নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা গোটা দেশের স্বাস্থ্যকে বিনষ্ট করবে। বস্তুতঃ এরই মধ্যে ওই দুর্লক্ষণ অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী দুর্নীতি দেশের সমস্ত জনজীবনে ছড়িয়ে পড়েছে।

নির্বাচনী রাজনীতিতে টাকার খেলাটাই যে মুখ্য তার বহুতর প্রমাণ দেওয়া যায়।

শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই ঃ

দীপালী প্রেস

১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

দর্পণ

পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের

শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানাচ্ছে

এবং এই টাকার খেলার বিষয়ের পরিণাম গোটা দেশের অর্থনীতিকে যে কেমন করে জনস্বার্থের বিরুদ্ধ খাতে চালিত করে জনজীবন বিপর্যস্ত করছে তারও বহু জলজ্যান্ত নিদর্শন উপস্থিত করা যায়। টাকাই নির্বাচনের মূল ভিত্তি এবং টাকাই তার 'জান'। টাকা না হলে নির্বাচনে এক-পা এগোবার উপায় নেই। সেইজন্যই দেখা যায়, লোকসভার অভ্যন্তরে সংসদীয় বিধায়কগণ আইন করে 'কোম্পানী ডোনেশন' বন্ধ করলেও ব্যবসায়ী কোম্পানী-গুলির কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের প্রক্রিয়ার এতটুকু ঢিল পড়েনি, বরং কোন কোন দিক থেকে কোম্পানীগুলি থেকে গৃহীত চাঁদার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনে যেটা বিধিবদ্ধ হয়েছে সেটা একটা লোক-দেখানো ভাঁওতা মাত্র। তার অস্তিত্বের কিন্তু নেই। সকলেই জানে এই বিশেষ আইনটি পালন অপেক্ষা লঙ্ঘনের জন্যই সর্বাধিক উদ্দিষ্ট, আর তার সেইভাবেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

এই অলিখিত ও বেআইনী কোম্পানী ডোনেশনের সুফল যদিও শাসক পক্ষই সবচেয়ে বেশী মাত্রায় ভোগ করে, তবে অন্যান্য দল-গুলিও যে তার সুফলভাগী হয় না সে কথা ঠিক নয়। ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলির চালক-কেন্দ্র তাঁদের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী নির্বাচনী রাজনীতির খাতে চাঁদা দিয়ে থাকেন—তাঁদের পক্ষপাতের পাল্লা কখনও শাসক দলের দিকে ঝোঁকে কখনও বিরোধী দলগুলির দিকে। হাওয়ার গতি বুঝে এই পক্ষপাতের গতিমুখ নির্ধারিত হয়। অভিনয় চতুর ও ধূর্ত এই ব্যবসায়ীরা। তারা নির্বাচনযুদ্ধের পরস্পর-প্রতিযোগী, প্রায়ই বিবদমান, পক্ষগুলির নির্বাচনী খাতে যে চাঁদার অঙ্ক দান করে দেয়, তার অনেক বেশী টাকা তারা তুলে আনে নির্বাচনোত্তর অর্থনীতির বাজার থেকে। তারা তাদের বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যাদির কৃত্রিমভাবে উৎপাদনে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে যে চাঁদার টাকা মুহূর্তে-মাত্রেই চতুর্গুণ আহরণ করে নেয়। কারও অবিদিত নাই যে, এ বিষয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে। নইলে এ তাজ্জব ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয় যে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে যাবার পরই একাধিক জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ চড়াৎ করে চড়ে যায় এবং শাসকশ্রেণী সমেত তাবৎ রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে তার কোন প্রতিবাদ হয় না? মূল্যবৃদ্ধি রোধার জন্য আন্দোলন করা তো আরও পরের কথা। পণ্যদ্রব্যসমূহের আকস্মিক বর্ধিত মূল্যস্তরের সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির নীরবতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রার্থী নির্বাচনের রহস্য

প্রার্থী নির্বাচনের বেলায় যদিও দলের প্রতি আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও দলীয় কাজের রেকর্ডকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে প্রকাশ্যে বলা হয়, এবং বলা হয় যে যোগ্যতাকেই মনো-নয়নের মাপকাঠি স্বরূপ বিবেচনা করে তবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ভিতরের কথা যাঁরা জানেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, যে দলসভ্য নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী টাকা নির্বাচনী খাতে দিতে পারেন বা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, তাঁর পক্ষেই প্রায়শঃ মনোনয়ন জোটে—এর ব্যতিক্রম কদাচ দৃষ্ট হয়। এই সম্ভাব্য মনো-নয়ন প্রার্থী যদি নিজে ধনী হন এবং নির্বাচনী তহবিলে মোটা অঙ্কের টাকা জমা দিতে সমর্থ হন তাহলে তো কথাই নেই, তা যদি না সম্ভব হয় তো তার এমন সংগঠনবল কিংবা বিস্তৃত জানাচেনার পরিধি থাকা চাই যার প্রভাব কাজে খাটিয়ে তিনি স্বল্পতর অর্থ খাতে এনে বন্ধুত করতে পারেন। তাঁর এই বা সংগ্রহ কার্য নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার তার-তম্যের উপরেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে তিনি নির্বাচন-যুদ্ধে দলের মনোনয়ন পাবেন কি পাবেন না। দলীয় আনুগত্য বা আদর্শনিষ্ঠা বা যোগ্যতার বিচারে মনোনয়ন দেওয়া হয় এ সব আদলে ছেঁদো কথা, প্রায়ই ধনবান কিংবা প্রভাবশালী সভ্যের অনুকূলে মনোনয়নের শিকা ছিঁড়ে পড়ার দৃষ্টান্তই বেশী।

এই রীতি যে শুধু জানিয়ে-শুনিয়ে যেগুলি বুর্জোয়া পার্টি তাদের দলেই অনুসরণ করা তা-ই নয়, যে সব পার্টি ও গ্রুপের পার্টি বলে পরিচিত এবং জনসেবার চিলকড়াও কপালে এঁটে সচরাচর রাজনীতি চর্চা করে থাকেন, সেই সব মধ্যপন্থী বা বামপন্থী দলগুলিরও একই হাল। বাইরে জনগণের পাশে থেকে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করার ভেক ধরেই থাকেন; ভিতরে পার্টির মধ্যে যাঁরা আর্থিক দিক থেকে সমধিক শাঁসালো ব্যক্তি তাঁদের কোলের দিকে কোল টানবার অভি-মুখেই বেশী ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এটা কী নির্বাচনী মনোনয়নের বেলায় কী সাধারণ পার্টি পরিচালনার বেলায় একই রকম বিলক্ষণ-ভাবে প্রকট হয়ে চোখে পড়ে।

ফলে দক্ষিণপন্থীই বলুন আর মধ্যপন্থীই বলুন আর বামপন্থীই বলুন আমাদের দেশের সকল প্রচলিত রাজনৈতিক দলেই বুর্জোয়া-দেরই আধিপত্য—ধনিক বণিক নবধনিক শ্রেণীর মানুষদের স্বার্থপূরণের তাগিদেই অধি-কাংশ সময় পার্টিসমূহের কাজকর্ম চলে। সত্যিকারের জনগণের পার্টি আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত একটিও জন্মায়নি। মুখে সকলেরই জনসেবার তড়ং লেগে আছে, কার্যতঃ সংগ্রামের রাস্তা পরিহার করে, বৈপ্লবিক কার্য-ক্রমের ছোঁয়া থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির নিরাপদ বাঁধা সড়ক মাড়িয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইতেই সকলে ব্যস্ত।

ক্ষমতার আলোচনার প্রসঙ্গে যে কথাটা

প্রথমেই বলা দরকার তা হলো, আমাদের দেশে ভোটের রাজনীতি পরিচালিত হয় দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে—(১) যেন-তেন-প্রকারেণ-ক্ষমতায় আসা; এবং (২) ক্ষমতার গদীতে একবার কোন গতিকে চড়ে বসতে পারলে ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক সেই ক্ষমতা রক্ষা করে চলা। অর্থাৎ ক্ষমতা অর্জন এবং ক্ষমতা সংরক্ষণ, ক্ষমতা আহরণ এবং ক্ষমতা ধারণ—এই বিবিধ উদ্দেশ্যের বেদীমূলে অন্য সব কিছুর বিসর্জন। ক্ষমতাই একমাত্র ধ্যান জ্ঞান উপাস্য, আর সব বাজে, অবান্তর, অনাবশ্যক। রাজনীতির কোন বালাই নেই, সত্যের কোন দায় নেই, এমনকি ন্যূনতম রাজনৈতিক ঔচিত্যবোধেরও তোয়াক্কা নেই এখনকার রাজনীতিওয়ালাদের মধ্যে। এঁরা রাজনীতির ব্যবসায়ী, নীতিকারের রাজনীতিক নন।

স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁরা চিন্তাধারায় রক্ষণশীল আর বিতাবস্থার পক্ষাবলম্বী হলেও এবং অধুনাতন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তাঁদের আদৌ কোন কর্ষণা না থাকলেও তাঁদের একটা আদর্শনিষ্ঠা ছিল, ছিল ত্যাগ তিতিক্ষা সততা। তাঁরা সব মূলগতভাবে ছিলেন সৎ লোক, নাই বা থাকুক তাঁদের উপযুক্ত সমাজ চেতনা, অর্থনৈতিক সমবন্টনের নীতিতে বিশ্বাস। সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণায় মানুষ তাঁরা অনেকাংশে মানসিকতায় রক্ষণশীল ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রায়ই একটা উদার পরার্থপরতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা দেশসেবার কাজে নামতেন, ব্যক্তিগত লাভালাভের অঙ্কের হিসাব, এমন কি ধনীর স্বার্থ পূরণের সমস্ত কোনটাই তাঁদের কাজের নিয়ামক ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা লড়াই করছেন এই জানেই ছিল তাঁদের তৃপ্তি।

কিন্তু এখন সব কিছু উল্টো।

পুস্তক পুস্তিকা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

দর্শন		
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (২য় সংস্করণ) (কার্ট, হেগেল)	মনোরঞ্জন বসু	৯·০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (২য় সংস্করণ) (প্লেটো, এ্যারিষ্টটল)	ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী	৮·০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (২য় সংস্করণ) (লক, বার্কলি, হিউম)	ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী	৭·০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (স্পেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ)	ডঃ চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য	৬·০০
বেদদর্শন (২য় সংস্করণ)	অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
নীতিবিদ্যা (২য় সংস্করণ)	ডঃ সুধীরকুমার নন্দী	১৫·০০
প্রতীচ্যে রায়	ইন্দ্রকুমার রায়	৭·০০
এক্সপ্লোরেশনের দর্শন	সুশীল চক্রবর্তী	৯·০০
ইমানুয়েল কাণ্ট	রমারঞ্জন কবির	৫·০০
সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান	রমাপ্রসাদ দাস	২৫·০০
ন্যায় পরিচয়	ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	১১·০০
ন্যায়ের দর্শন	রাসবিহারী দাস	১৫·০০
বন্ধনতত্ত্ব	ডঃ সুধীরকুমার নন্দী	২০·০০
ক্রয়েড	সুনীলকুমার সরকার	৯·০০
কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর)		
প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচয় (১ম খণ্ড)	বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত	৪·০০
প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচয় (২য় খণ্ড)	বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত	৬·০০
প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচয় (৩য় খণ্ড)	বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত	৬·০০
উদ্ভিদবিদ্যা		
সাইটোলজি	সুচিতা গুহ	১৮·০০
উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান	নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	৮·০০

আরো অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩

এখন সবার আগে পার্টি, তার পরে অন্য সব। জাতীয় স্বার্থের অনেক উপরে এখন পার্টির স্বার্থ। সে-স্বার্থও আবার নিতান্ত স্থূল বৈষয়িক ধরনের স্বার্থ—যে কোন উপায়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং একবার ক্ষমতা কব্জা করতে পারলে দাঁত-কপাটি লাগিয়ে হলেও সেই ক্ষমতা ধরে থাকা। এই ক্ষমতা অধিকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ জনগণকে ঢাবার ঘুঁটি স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। মুখে জনগণের প্রীতিকর হাজারো গালভরা বুলি লেগেই আছে কিন্তু ওই মুখরোচক কথাগুলোর একমাত্র লক্ষ্য—দলের শক্তি, স্থায়িত্ব, সীমা-সরহদ্দের এলাকা বাড়ানো, বাড়িয়ে চলা। দেশ গোল্লায় গেলেও এই লক্ষ্যসিদ্ধির কাজে ঢিল দেওয়া চলবে না। আর এই লক্ষ্যসিদ্ধির প্রাণান্তকর তাগিদ থেকেই নির্বাচনে যত প্রকারের ধুন্ধুমার, ধক্কাতি ও জোচ্চুরি।

বর্তমানে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে নির্বাচনকে একটা প্রচণ্ড তামাসা বলাই যথেষ্ট নয়, বলা উচিত একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক তামাসা, সাংঘাতিক ক্ষতিকর তামাসা, অতিশয় কঠিন মূল্যে দেশবাসীকে যার মাশুল গুণে দিতে হচ্ছে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর কিন্তু যার প্রভাব চারিয়ে যাচ্ছে গোটা দেশের জনজীবন, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের কাঠামোর মধ্যে, এই তিনের ভিতরই চূড়ান্ত ধরনের নীতিবোধের বিপর্যয় ঘটিয়ে।

লোক দেখানো উপকার

ভোটের রাজনীতি কীভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে তার দু-চারটি নমুনা প্রদর্শন করছি। এই যে সরকারী কর্মচারীরা কাজ না করলেও, জেনে শুনে কাজে ফাঁকী দিলেও, তাঁদের হপ্তায় হপ্তায় মাইনে, ডি, এ, ইত্যাদি বাড়িয়ে চলা, ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আর্থিক দিক থেকে অন্য সব ধরনের চাকুরিজীবীদের তুলনায় প্রভূত ঈর্ষণীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের মাহিনা-বৃদ্ধির আন্দোলনে ঘনঘন মদত দেওয়া, কারখানার শ্রমিকেরা তাঁদের ন্যূনতম কর্তব্য না করেও ওভারটাইমের জন্য যাহারা ধরলেও তাঁদের সে-বাহানাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অধিকার দাবি করার আগে কর্তব্যকরা রূপ যে একটা ছোট্ট করণীয় থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই ছোট্ট করণীয়টুকু পালন না করার আগে যে অধিকার জন্মায় না—এই সারসত্যকে সযত্নে চেপে গিয়ে শ্রমিকের জন্য দরদের আতিশয্যে হাপুসনয়নে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেওয়া—এ সবের একটাই শুধু উদ্দেশ্য : এই সব শ্রেণীর মানুষের সহানুভূতি আদায় করে ভোটের বাক্সে তাঁদের সমর্থন অর্জন।

শুধু কি তাই? এই যে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভাগুলি ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকেই বেকার ভাতা, বিনামূল্যে শিক্ষা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গণিকার কল্যাণ, কৃষি-পেনশন, কৃষি ঋণ মকুব, বিধবা-ভাতা, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য আর উদীয়মান লেখকদের বই ছাপানোর খরচ প্রভৃতি এবং অনুরূপ আরও নানাবিধ খাতে দান-খয়রাতের 'মহোচ্ছব' লাগিয়ে যেন, তার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য—নির্বাচনকালে লাভবান শ্রেণীগুলির কাছ থেকে নির্বাচনী সমর্থন লাভ।

বলা হবে বিলক্ষণ উদ্দেশ্য যা-ই হোক কাজগুলির প্রকৃতি তো সত্যিই ভাল, এগুলির দ্বারা সমাজের বেশ কিছু অংশের মানুষের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হচ্ছে সে কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কথা হলো,

শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

গ্রহণ করুন

দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং

১৭, মহেন্দ্রলাল সরকার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

সমাজকল্যাণটাই শেষ নয়, সমাজকল্যাণের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টিকেও হিসাবের মধ্যে অবশ্যই গণনা করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, উপরুক্ত পদক্ষেপগুলির কল্যাণ বিধান তাঁদের প্রতি যথার্থ আন্তরিক ভালোবাসা বশতঃ নয়, পরন্তু নিজেদেরই আখের গুছোবার মতলবে সেক্ষেত্রে অভিপ্রায়ের প্রশ্ন তুলতে হবেই। আর অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে অভিপ্রায় এবং ক্ষেত্রে সদভিপ্রায়ের আকারে আসে না, আসে অভিসন্ধির রূপ ধরে। অভিপ্রায় এখানে অভিসন্ধির সমার্থক।

কিংবা ধরা যাক, নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার কিছুদিন আগে থেকেই যে সরকারী স্তরে বিভিন্ন ঘরোয়ার গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে একটানা একটা অছিলায় নানাবিধ আর্থিক অনুদান বা সুবিধা-সুযোগ মঞ্জুর করার ধুম পড়ে যায়, এমনকি ঐ বাবদে রাজকোষ মুক্ত করে দিতেও বাধে না,—তারও মূলে আছে একমেবাদ্বিতীয়ম উদ্দেশ্য—বিভিন্ন শ্রেণীর মন পাওয়ার চেষ্টা করা এবং তাদের মন জয় করে ভোট আদায়ের ইচ্ছা।

সেই জন্যই বলছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন একটা মহা অনর্থকর ব্যাপার। এদেশে স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে এবং টাকারই জয়জয়কার ঘোষিত হচ্ছে। লেনিন যা অর্থে সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত পার্লামেন্টকে "শূয়োরের খোঁয়াড়" বলেছিলেন আমি জানি না, তবে আমার গত ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতা যে একই সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে সে কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

বিকৃতির সাহিত্য

সুপ্রিয় ধর

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যেচ্ছাচারের এবং অনাচারতার হাওয়া বেশ প্রবল। অর্থাৎ শিল্পী সাহিত্যিকদের এককভাবে কিংবা সংগঠিত ভাবে যে উদ্দেশ্যপ্রবণতা এবং সংলগ্নতা-বোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল সেই কর্তব্যের কথা যেন সবাই বিস্মৃত হয়ে গেছেন। সাহিত্যে যদি সামাজিক পরিবর্তন এবং মানুষের জীবন সম্বন্ধে মনস্কতা না থাকে তবে সেই সাহিত্য জীবন বিরোধী হতে বাধ্য; এবং সন্দেহ নেই আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই জীবনবিরাগী হাওয়াই বইছে সম্প্রতি। যৌনতা এবং ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নিয়েই সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের কাজ-কারবার। বিষয় সৃষ্টি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সামগ্রিকতা ও সংলগ্নতার বোধ লেখকের কালোচিত কর্তব্য জ্ঞানের পরিচায়ক, তা অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে। এই সমস্ত লেখকেরা স্বরচিত, অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার নিজস্ব জগত দিয়েই বাংলাদেশের পরিমাপ করছেন, এবং ফলত গোটা ব্যাপারটাই বিকৃত, কৃত্রিম এবং অনুকরণপ্রিয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘটনা বা চরিত্র কোন বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত পায় না অভিজ্ঞতার অভাবে, মননের অব্যবহারে।

আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে যে সমাজটাকে আমরা পাই, তা ইউরোপ আমেরিকার সাহিত্যে বর্ণিত মনোভাব এবং পারিপার্শ্বিকতার ছবি মনে আনে। সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ে অনেক উৎসাহী পাঠক এবং সমালোচক প্রায়ই বলে থাকেন এঁরা নাকি আমাদের চেনাজানা নাগরিক জীবনের নানাবিধ যৌন অনাচার এবং বিচ্ছিন্নতা চেতনার সার্থক রূপকার। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে না, বাংলাদেশের নব্বই শতাংশ মানুষ যেখানে আজো সামন্ত-তান্ত্রিক আচার অনাচারের জালে আবদ্ধ, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়ার ফলে আজো যে দেশে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের এক বিস্ময়-কর সহাবস্থান চলছে, এবং এই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ততদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে যতদিন না শিল্পকরণ ব্যাপকভাবে সামন্ত-তান্ত্রিক সৌধগুলোকে ভেঙে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং যে দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ পরিপূর্ণ ভাবে না হওয়ার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি অপরিবর্তিত আছে সেক্ষেত্রে সমরেশ বসু, সুনীল গাঙ্গুলীরা কতো ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বেদনা বহন করেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে যৌনতা এবং বিচ্ছিন্নতা-চেতনা সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়মেই এসেছে, কেননা ব্যাপক ধনতান্ত্রিক শিল্পকরণ সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে ব্যক্তিকে ছিন্নমূল ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। আমাদের সাহিত্যিকরা সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের চেহারাটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নয়তো ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হচ্ছেন। ইউরোপ-আমেরিকায় ধনতন্ত্র আজ চরম স্তরে এসে পৌঁচেছে, আমাদের দেশটা এখনো পর্যন্ত অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ তার সামন্ততান্ত্রিক কাঠা-মোকে বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং ইউরোপ-আমেরিকার সাহিত্যে যে যৌনতা এবং বিচ্ছিন্নতা-চেতনার বর্ণনা পাই, তার মূলে আছে ব্যাপক ধনতান্ত্রিক যন্ত্র-সভ্যতার বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি সামাজিক নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা এবং সমাজের সঙ্গে পরিবারের, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সীমাহীন দূরত্ব। আমাদের দেশের চেহারাটা কি ইউরোপ-আমেরিকার সমগোত্রীয়?

ইউরোপ-আমেরিকার সাহিত্যে যৌনতা, বিচ্ছিন্নতা-চেতনার একটা সামাজিক কারণ আছে। একথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই যে পাশ্চাত্যে এখন চলছে ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার শেষ ধাপ। এবং মার্কসবাদী দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখলে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বৈরিতাদুষ্ট সম্পর্ক ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশেরই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। কাফ্‌কা, কাম্যু, বেকেট এঁরা এই সামাজিক ও আত্মিক বিচ্ছিন্নতাকেই একটা ভয়ংকর সত্য হিসেবে তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। আর আমাদের বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্যের এই লেখক সম্প্রদায়কেই অনুকরণ করে চলেছেন, কিন্তু খেয়াল করছেন না আমাদের দেশের সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক সূত্রটাকে। আর তাই কামুর দি আউটসাইডার বা দি ফল-এর মতো সার্থক জীবনবিরাগী উপন্যাস এঁদের সাধ্য এবং কল্পনার অতীত। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সব লেখকের তথাকথিত যৌনতা এবং বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আধুনিকতার চিৎকার মেকি, অন্তঃসারশূন্য ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা যে দেশে শিল্প সভ্যতা শহর ছাড়িয়ে এখনো গ্রামের দিকে পা বাড়ায় নি, যে দেশে গুটি-কয়েক শহর বাদ দিলে গোটা দেশটাই মধ্য-যুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত, যে দেশে এখনো প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা এবং

আধুনিক শিল্পের সহাবস্থান প্রায় এবং শহরকে বিভিন্ন ভাবে রেখেছে, সেখানে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বা যৌনতা নিয়ে চিৎকারের পেছনে কতটুকু সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক সত্য থাকতে পারে? স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের উপন্যাসে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ স্থান পাচ্ছে, তার কোন সামাজিক ভিত্তি নেই, তা প্রধানত পশ্চিমী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে অবশ্য যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার ঘটনাকে বিচ্ছিন্নতা চেতনার কারণ হিসেবে চাঁড় করাতে চান। শহরাঞ্চলে হয়তো যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে এক ক্ষুদ্র তরাংশের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু শহরের ক্ষুদ্র তরাংশই কি সমগ্র বাংলাদেশ? কেননা গ্রাম বাংলায় তো এখনো পর্যন্ত যৌথ পরিবারই আদর্শ এবং পিতা চালিত পরিবারই মৌলিক সামাজিক কেন্দ্র। ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে কতটুকু? কামুর আউটসাইডারে নায়ক মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যেতে পারে, কেননা এটা হলো পশ্চিমী ব্যক্তিচেতনার বা বিচ্ছিন্নতার সর্বোচ্চ স্তর। কিন্তু আমরা তো এখনো সেই স্তরেই আসি নি। এখনো তো আমরা মা, বাবা বা অন্য কোন প্রিয়জন মারা গেলে আমাদের প্রাচীন সংস্কারের দ্বারাই পরিচালিত হই, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার দ্বারা বিবর্জিত হই। অথচ সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দুরা আধুনিক চেষ্টা করছেন এটা প্রমাণ করার যে আমরা বাংলাদেশের সবাই কামুর নায়ক হয়ে গেছি!

আসলে আমাদের সাহিত্যিকরা একটা বিশ্বিত জীবের মধ্যে আবদ্ধ। নিজেদের খণ্ডিত অভিজ্ঞতার জগতেই তাঁরা আবর্তিত হচ্ছেন। জীবন যে অনেকটা বিস্তার—এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে অনুধাবন করার ইচ্ছা, চেষ্টা বা আগ্রহ কোনটাই এঁদের নেই। তাছাড়াও যে বলিষ্ঠ জীবনদর্শন থাকলে বিচ্ছিন্নতা কিংবা যৌন চেতনাও সামাজিক বৃহৎ আয়তন পায়, নতুন মাত্রা পায় সে রকম দর্শন আমাদের সাহিত্যিকদের কোথায়? আর সে দর্শন নেই বলেই জীবনবোধের বদলে যৌনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরিস্তরটাই মুখ্য বলে ধরা পড়ে। সমরেশের নায়কেরা সর্বদাই শরীরসর্বস্ব চিন্তায় আক্রান্ত, যদিও সমরেশ একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নায়কের চারপাশে তৈরী করেন, এবং এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন যেন চারপাশের রাজনৈতিক অবক্ষয়ই নায়ককে দেহসর্বস্ব চিন্তার ঘর হতে বাধ্য করে। কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবেশ নির্মাণেও সমরেশ খণ্ডিত অভিজ্ঞতার শিকার, কেননা আমাদের চেনা-জানা বাংলা দেশের চেহারাটা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। ফলত ব্যাপকতম মানুষের বিশালতর সংগ্রামের চেহারাটা তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত সুচতুরভাবে অনুপস্থিত থেকে যায়। সুনীলের উপন্যাসে মূল বিষয় হিসেবে আসে একটি বন্ধুগোষ্ঠী, কলেজে পড়া কিছু ছেলেমেয়ে যারা দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, বর্তমান আন্দোলন আলোড়ন সম্বন্ধে কোন আগ্রহই দেখায় না, শুধুমাত্র শরীরী বেদনা আর উল্লাসের মধ্যেই তারা আবদ্ধ থাকে। এ কোন বাংলা দেশের চেহারা সুনীল তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেন? বুঝতে অসুবিধা হয় না সুনীল, সমরেশ, শীর্ষেন্দুরা বৃহত্তর জীবন থেকে কি নিদারুণ ভাবে বিচ্ছিন্ন। কিংবা উল্টোটাও হতে পারে। হয়তো সব কিছুই এঁরা বোঝেন, জানেন, শুধুমাত্র কুঁকি নিতে চান না এই ভয়ে যদি জীবনের বিরাগভাজন, দেশী-বিদেশী পুরস্কার এবং কর্তাব্যক্তিদের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতে হয়! জাঁ পল্ সার্ত্রের মতো কোথায় এঁদের সেই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন? যে সার্ত্রের নায়ক-নায়িকারা প্রায়শই বৈষয়িক বিলাসের মধ্যে অস্তিত্বের অর্থহীনতার হাত থেকে মুক্তির পথ খোঁজে, যে সার্ত্রের নায়ক নায়িকাকে বিয়ে করতে না চেয়ে গর্ভপাতের ওষুধ খোঁজে, সেই সার্ত্রে আবার 'আলতোনা' নাটকে মানবতার পক্ষে তাঁর প্রতিবাদী ঘোষণাকে উচ্চগ্রামে তুলে ধরেন। সেই একই সার্ত্রে আবার এক-নায়কতান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ বিক্ষিভের নেতৃত্ব দেন। আমাদের লেখকদের কোথায় সেই দর্শন, সেই সাহস? সুতরাং সহজেই বোঝা যায় একটা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি কাজ করছে এই সব লেখকদের রচনার পেছনে। একমাত্র সুস্থ জীবনভিত্তি সাহিত্য সৃষ্টি করেই এ ধরণের বিকৃতির সাহিত্যের যোগ্য সাহিত্যিক প্রতিরোধের পথ নির্বাচন করতে হবে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা-সমাজ ঃ বিরোধ ও মিলনের সূত্র

প্রদীপ রায়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা-সমাজ আধুনিক বাংলা তথা তারত ইতিহাসে সৃষ্টিতে যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে —একথা ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য। আলোচ্য-কালে এই কলকাতা-সমাজে নানা বিচিত্র শক্তির সমাবেশ ঘটেছে, বিচিত্র শক্তি সমাজ-নিয়ন্ত্রণের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশায় পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। অবশ্য দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যে নিরবচ্ছিন্ন একথা বলা যায় না। কখনও কখনও বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এক শক্তি অন্য-স্থানেই অপর এক শক্তির সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্বকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে, মৈত্রী স্থাপন করেছে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আবার সমাজ জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে বিদ্যমান শক্তিগুলি যে সবক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছে বা একটি বিশেষক্ষেত্রে সুবিধান শক্তি যে অপর একটি ক্ষেত্রেও পরস্পর বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বে-কারণে শক্তি সমাবেশও ভিন্ন ভিন্ন গতি-প্রকৃতি, লাভ করেছে। একথায় বলা যায় পরস্পরের সম্মুখীন তৎকালীন শক্তিগুলি যেমন ছিল বিচিত্র তেমনি বিচিত্র ছিল তাদের দ্বন্দ্ব ও মিলনের ইতিহাস। এই বিচিত্র ইতিহাসই আধুনিক বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসের ঐতিহ্যকে করে তুলেছে আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ।

উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতা-সমাজে দেশী ও বিদেশী উভয় সম্প্রদায় এসে সমবের দৃষ্টিগোচরে বসবাস করেছে বটে তবে সকলের মৈত্রীভাব লাভ করেছে। দেশী সম্প্রদায়ের প্রধান অংশ বেনিয়ান, দেওয়ান, মুৎসুদ্দী, গুমস্তা এবং তাঁদের আশ্রিত, কারিগর, বিভিন্ন জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সৈনিক কর্মচারী এবং বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত ইংরেজ বণিকদের নিয়ে গঠিত বিদেশী সম্প্রদায়। দেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম, বিদেশী সম্প্রদায়ের ধর্ম খ্রীষ্ট ধর্ম। দেশী সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মাবলম্বী অংশ একদিকে নানা কার্যকারণে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। যেহেতু সাধারণভাবে এ-সময়ের কলকাতা-সমাজে দেশী সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মাবলম্বী অংশ সমবয়ের বাসনা লাভ করেছে

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত-কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ধীরে ধীরে কৃষ্ণ কলকেশে পূর্ব ও উত্তরভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে অগ্রসর হয়েছে, বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্রমে প্রত্যক্ষ শাসনও প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে কম্পানীর নীতি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে হস্তক্ষেপ না করাই ছিল এই নীতির [illegible] বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তারতীয় রীতিনীতি ও সামাজিক রীতি-নীতির সহকারী মানে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বহু বহু হিন্দুদের ও মুসলমানদের নিয়ে ইংরেজ-দুর্গে [illegible] হয়েছে। [illegible] তাঁরা তারতের ইংরেজ সরকারের পক্ষে কালী-ঘাট প্রভৃতি তীর্থে বহু বহু হাঁকরে পুরোহিতের দ্বারায় পূজা, [illegible] করেছেন। বিদেশী ইংরেজ শাসকবর্গের এক অংশের পক্ষেও তারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি তাঁদের প্রকাশ মনোভাবই থাকে যে-সময় তারতের ইংরেজ শাসনাধীন অংশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এবং ঐ উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টধর্ম যাজক প্রেরণের কথা কম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে চিন্তা করতেন। তাঁদের এই আশঙ্কা ছিল, খ্রীষ্টান মিশনারী ইংরেজ অধিকৃত তারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রসর হলে এ-দেশের প্রজা-সাধারণ তা তারতবর্ষে গ্রহণ করবে না এবং তারই ফলে এ-দেশে ইংরেজ অধিকার বিপন্ন হতে পারে। যাহোক তারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি ইংরেজ সরকারের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী কলকাতা-সমাজের দেশী অংশের ধর্মজীবনে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে যে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য পূর্ববর্তী ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক নানক, কবীর, দাদু ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির

প্রচেষ্টায় ভারতীয় বর্ণাচরণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির বাস হয়েছিল তা অস্বীকার ক'রে ক্লাইভ এবং তাঁর পরবর্তী ইংরেজ শাসকেরা বিচার ও আইন প্রণয়নের যে নব সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল হস্তুস্মৃতি থেকে শুরু করে প্রায় সকল ব্রহ্মণীয় শ্রাদ্ধশাস্ত্রের নিদেশক নীতি সম্বলিত বলহায়, রচিত ও প্রকাশিত হ'ল হালহেডের কোর্ট-কোড (১৭৭৫), আর ইসলামের ব্রহ্মণীয় চিন্তাধারা সম্বলিত হিদায়া (Hedaya) পুস্তিকার পারসী ভাষায় অনুবাদ। ভারতীয় সমাজে এই দুই মূলপ্রদায়ী শাসন কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করে ভারতীয় সমাজের 'ভক্তি-আন্দোলন' বিরোধী ব্রহ্মণীয় অংশ সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করল।

এদিকে ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মণীয় কুশিক্ষার ব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এ পরিণতি লাভ করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করে নবোদ্ভূত জমিদারশ্রেণী বঙ্গ-সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার চূড়ান্ত অধিকার লাভ করল। নূতন ভূমি ব্যবস্থার প্রয়োজনোপযোগী এই জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণভুক্ত। অন্য দিকে কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর শ্রেণীর প্রায় সকল বিত্তহীন অসহায় ব্যক্তি ছিল নিম্নবর্ণভুক্ত। ফলে বৃটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশে সামাজিক বর্ণভেদের অর্থনৈতিক বর্ণভেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, সামাজিক বর্ণভেদের বজ্রকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখে। সে-কারণে জাতিভেদ প্রথা এ ব্যবস্থায় অধিকতর ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা লাভ করেছে সন্দেহ নেই।

বস্তুত কোম্পানীর আমলের উপরিউক্ত দুইটি সংস্কার ভারতীয়দের জীবনে ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতিকে উদ্দীপ্ত না করে বরং ভক্তি আন্দোলন বিরোধী মনোভঙ্গীর জন্ম-দাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হবে না যে কোম্পানীর শাসনের প্রথম পর্বে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারতীয় ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচরণে কোম্পানী হস্তক্ষেপ করেছে, তবে সে হস্তক্ষেপ রক্ষণশীলতার অনুকূলে।

অন্যদিকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সনদ পুনর্গ্রহণের সময় ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহী চার্লস গ্রাণ্ট এবং উইলবার ফোর্স অন্যান্য কারণ সহ এদেশীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বৃটিশ অধিকৃত ভারত ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে চার্লস গ্রাণ্ট এবং উইলবার ফোর্সের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর অভিমত হ'ল: "the Hindus had as good a system of faith and morals as most people and that it would be madness to attempt their conversion or to give them any more learning or any other description of learning than what they already possess." ৪

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড এই তিন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী দিনেমারের অধিকৃত শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের সূত্রপাত করেন। উক্ত তিন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক কলকাতায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়েই দিনেমারদের অনুমতিক্রমে শ্রীরামপুরে তাঁদের ধর্মপ্রচার কার্য শুরু করেন। পীতাম্বর সিং নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে তাঁরা প্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তারপর উত্তরোত্তর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত ভূখণ্ডে কোম্পানীর বিরোধিতায় তখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেনি।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পুনরায় সনদপ্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে ইংরেজ অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের সুযোগ সৃষ্টি এবং সে উদ্দেশ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। উইলবার ফোর্স খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেন। পার্লামেন্টে বক্তৃতাকালে (জুন, ১৮১৩) উইলবার ফোর্স হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "Hindu divinities were absolute monsters of lust, injustice, wickedness and cruelty. In short their religious system is one grand abomination."৪(ক) এমন কি ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিও লর্ড সভায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুকূলে বক্তব্য রাখেন। ভারতের ধর্মীয় ও নৈতিক অধোগতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে Lord Teignmouth (John Shore) মন্তব্য করেন: "Only the strong ethical content of christianity could eradicate the deeply rooted deceit obscenity, and tendency toward corruption."৫ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে এ বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এদেশীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য কোম্পানী অধিকৃত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকের বসবাস বিষয়ে আইনানুগ যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া হয়। ফলে ইংরেজ অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে এতাবৎকাল যে বাধা ছিল তা অপসারিত হ'ল এবং স্বভাবতই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের সমাজ সংস্কারতা দেখা দিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে যে সব প্রতিষ্ঠান

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশন, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, চার্চ অব ইংল্যাণ্ড এবং পরবর্তীকালে স্কটিশ মিশন অবশ্য উল্লেখ্য। এইসব মিশনের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ছিল কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে এবং ভারতীয় যে কোন ধর্ম যে কিরূপ নিকৃষ্ট তা প্রতিপন্ন করার বিষয়ে এদের পরস্পরের প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়।

ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে মিশনারীদের অবজ্ঞাসীন, বিরূপ মন্তব্যাদি কলকাতা-সমাজের দেশীয় অংশের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বিষয়ে কম্পানীর সরকারের অনুসৃত নীতি পরোক্ষ ভাবে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে নানক, কবীর, দাদু ও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বদ্ধমূল সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছে এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ঠিক পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় মিশনগুলির আগ্রাসী ধর্মপ্রচারে আইনানুগ সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করে কম্পানীর সরকার অনুরূপভাবেই দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীল শক্তির রক্ষণশীলতার বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করেছে। এ সময় কলকাতার দেশীয় সম্প্রদায় যেন এরই ফলে ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সনাতনী আচরণ পদ্ধতিকে অধিকতর প্রদ্ধা জানিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত হয়েছে। অবশ্য মিশনারী কার্যকলাপের ফলে কলকাতার দেশীয় সম্প্রদায় চিরাচরিত ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে যে ইতিমধ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কম্পানীর শাসনের প্রথম পর্বে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কম্পানী যেমন 'হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ' করেছে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ নীতি গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পানীর এরূপ নীতি গ্রহণের ফলে আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভিত্তিক অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থা পৃষ্ঠপোষক অভিজাতদের অনুপস্থিতিতে আর্থিক আনুকূল্য ও পরিচালনার অভাবে ক্রমশই ম্লান হতে চলছিল। ইংরেজ শাসক ও ইয়োরোপীয় বণিকদের সংস্পর্শে নবোদ্ভূত অভিজাতশ্রেণী, বিশেষত কলকাতা শহরের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, দেওয়ান প্রভৃতি জীবিকান্বেষী ব্যক্তি প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমশই অনুপযোগী হয়ে পড়ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষায় এদের আগ্রহ দেখে কলকাতা শহরে উনিশ শতকের সূচনা থেকেই কয়েকজন মিশনারী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে এসব স্কুলের ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ কম্পানীর সরকার শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

ভারতীয়দের শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পানীর এই ঔদাসীন্য ওয়ারেন হেস্টিংস, জোনাথান ডানকান প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সমর্থক বৃটিশ বণিকদের সমর্থন লাভ করেনি। হেস্টিংস এবং ডানকান ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যথাক্রমে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উভয়েরই এদেশীয়দের জন্য এদেশীয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওয়ারেন হেস্টিংস ও জোনাথান ডানকান এদেশীয়দের জন্য যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে এদেশীয়দের সনাতনী মনোভাবের সহায়ক। উপরন্তু প্রাচ্যদেশের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জোন্স-এর উদ্যোগে, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারত-শাসনে নিয়োগের পূর্বে ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় আচার-আচরণ, রীতি ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বৃটিশ সিভিলিয়ানদের পরিচিত করার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কলকাতা-সমাজের দেশীয় অংশের মানসিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বৃটিশ প্রাচ্যবিদ এবং বাঙালী পণ্ডিতদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, বিশেষত গৌরবোজ্জ্বল বৈদিক যুগের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এইসব আবিষ্কারের ফলে স্বভাবতই বাঙালী পণ্ডিতেরা ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্পর্কে ধর্মীয় অভিমানের বশবর্তী হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন উইলকিন্স, কোলব্রুক প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডীদায় প্রথার বিরোধিতা করেছেন এবং তৎকালীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত পুরাণভিত্তিক নানা সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণের সংস্কার সাধনে কম্পানীর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ভারতের বৈদিক যুগের ধর্ম ও আচরণকে যুগোপযোগী করে এ সংস্কার সাধন সম্ভবপর। ভারতের ধর্মীয় ও নৈতিক ঐতিহ্যের জন্য ভারতে খ্রীষ্টধর্ম ও ইয়োরোপীয় সামাজিক রীতি-নীতির প্রবর্তন আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। বরং এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ ভারতীয় সমাজে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা একরূপ নিশ্চিত।

অপরদিকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে সনদ পুনর্প্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে চার্লস গ্রাণ্ট এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের শিক্ষা বিস্তারের এক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রচনা করেন। উক্ত প্রস্তাবে অবশ্যই ইংরেজী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কম্পানী অধিকৃত

ভারত-ভূখণ্ডে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ ক'রে তিনি তাঁর পুস্তিকায় যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'for every great purpose of the proposed scheme, the introduction and use of that [English] language would be most effectual, and the exclusion of it, the loss of unspeakable benefits and a just subject of extreme regret—we shall also serve the *original design* with which we visited India, that design still so important to this Country—*the extension of our Commerce—our religion and our Knowledge* might be diffused over other dark portions of the globe, where Nature has been more kind than human institutions. This is the noblest species of conquest and wherever, we may venture to say, our *principles and language are introduced, our Commerce will follow*'. ৬ উক্ত বক্তব্য স্পষ্টই নির্দেশ করছে কম্পানী অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের জন্য চার্লস গ্রাণ্ট এবং তাঁর সমর্থক উইলবারফোর্স যে ওকালতি করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উক্ত সম্প্রসারণের অনুপূরক হিসেবে তা।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে চার্লস গ্রাণ্টের উক্ত বক্তব্য স্বীকৃতিলাভ না করলেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে ইংরেজ অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বিধিসম্মত করা হয়; ফোর্ট অব ভিক্টোরিয়া ভারতে কম্পানীর সরকারকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করে। উক্ত নির্দেশে বলা হয়: "প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করিতে হইবে। তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতসমূহের উৎসাহদান ও ভারতবর্ষীয় বৃটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইবে।"৭ [বিনয় পাঠকৃত অনুবাদ] শিক্ষাখাতে এই অর্থ ব্যয়ের অপর একটি কারণও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তৎকালীন শিক্ষার বাস্তব অবস্থা প্রসঙ্গে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো মন্তব্য করেন: '... ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে' এবং সুপারিশ করেন 'কাশীর কালেজ ব্যতীত, নবদ্বীপে ও মিথিলের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে আর দুইটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপন করা হউক।'৭(ক) লর্ড মিন্টোর সুপারিশে লক্ষণীয় বিষয় এই যে তিনি এতদ্দেশীয় শিক্ষার সম্প্রসারণের কথাই বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষার কথা নয়। যা হোক, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কম্পানীর সরকার শিক্ষার জন্য উক্ত বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। সুতরাং এতদ্দেশীয়দের শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পানীর অনুসৃত ঔদাসীন্যমূলক নীতির কোন পরিবর্তন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কার্যকর হয় নি, এ-সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় করা যায়।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারত ও চীনদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে ভারত-ভূখণ্ডে ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত ও সংহত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ায় বৃটিশ বণিকেরা ভারতের এবং চীনের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার অধিকার লাভে আগ্রহী হয়। উপরন্তু বৃটেনের নতুন নতুন শিল্প-সংগঠন এ-সময় থেকেই তাদের-ভূখণ্ডকে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজারে এবং শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে পরিণত করতে উৎসাহী হয়। কিন্তু কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার থাকায় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী ও কাঁচামাল আমদানীর জন্য বৃটিশ শিল্পপতি এবং বৃটিশ বণিককে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ওপর। অথচ এ-বিষয়ে কম্পানী প্রবর্তিত ব্যবস্থাদি যথোপযুক্ত নয় বলেই বৃটিশ শিল্পপতি ও বণিকদের স্থির সিদ্ধান্ত। সে-কারণে কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার অবলুপ্ত ক'রে সকল বৃটিশ বণিকের কাছে ভারতের বন্দরগুলি উন্মুক্ত করার দাবী উক্ত সংগঠনগুলি বারবার করতে থাকে। তারা এই অভিমত প্রকাশ করে যে তাদের দাবী গৃহীত হ'লে অবশ্যই বৃটিশ শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানীর ক্ষেত্রে বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানীর পরিমাণই হবে সর্বাধিক। ১৮১৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে সনদ পুনর্প্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক বৃটিশ বণিক ও বৃটিশ শিল্পপতি তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে চীনদেশ ব্যতীত ভারত-ভূখণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী সহ অপরাপর বৃটিশ প্রজাকে মুক্তরাজ্যের নির্দিষ্ট কয়েকটি বন্দর এবং ভারতীয় বন্দরের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হ'লে কম্পানীর স্বার্থরক্ষায় আরোপিত কয়েকটি বিধিনিষেধ ও শর্ত শিথিল হয়।৮ সুতরাং কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার এবং বৃটিশ বণিকদের অবাধ বাণিজ্যাধিকার লাভের মধ্যে পেণ্ডোক্ত নীতির আংশিক সাফল্য ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে প্রতিফলিত ঘটে কিন্তু উক্ত অধিকারের পূর্ণতর সাফল্যের জন্য বৃহত্তর ও বিস্তৃততর আন্দো-

P27654

লনের প্রয়োজন বোধ ছিল। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল ভারতে ইয়োরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার লাভের আন্দোলন। এই দুই আন্দোলনের প্রভাব সঞ্চারিত হয় কলকাতা-সমাজের বেশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও।

এভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক উন্নতির প্রশ্নে, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ বিষয়ে, শিক্ষাদীক্ষা প্রসঙ্গে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নানা বিরুদ্ধ শক্তি যখন পরস্পরের সম্মুখীন এবং পরস্পর চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম ত্যাগ করে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার ও পরিরক্ষণের মানসে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনায় রামমোহন স্বোপার্জিত অর্থে ক্রীত ভূ-সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যথার্থ জমিদার। বর্তমান কলিকাতা ও হুগলী জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপ্ত ছিল তাঁর জমিদারী। এ সময় শহর কলকাতায় তাঁর সম্পত্তির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। সুদের ব্যবসায়, কম্পানীর কাগজপত্রের ব্যবসায় ও ডিসবীর জেওয়ানপদের মাধ্যমে এবং কম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে কর্মসম্পাদনের সূত্রে ইতিপূর্বে ইয়োরোপীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে, বিশেষত অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ইয়োরোপীয় ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে পরিচয় এ সময় থেকে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

কলকাতায় রামমোহনের স্থায়ীভাবে বসবাস সেকালে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে কলকাতায় এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিক দিক থেকে অভীতাশ্রয়ী হলেও মনন ও কর্মকাণ্ডের দিক থেকে ইয়োরোপীয় চিন্তা ও ভাবাদর্শের দ্বারা আলোড়িত এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এ শ্রেণীর অনেকেই কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারভুক্ত, পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রেরণায় অস্থির, চঞ্চল। এঁদের অনেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন দ্রুত পরিবর্তনশীল শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গের রূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।৯ এমন কি অনেকেই ধর্মের সঙ্কীর্ণ সীমার বাইরেও নানাবিধ বিষয়ে উৎসাহী। অথচ এঁরা সবাই ছিলেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কলকাতায় রামমোহনের আগমন এই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবাহিত চিন্তাধারাকে সংহতি ও সংঘবদ্ধ নির্দিষ্ট কর্মসূচীর গ্রহণপরকে ত্বরান্বিত করে।

রামমোহনের কলকাতায় আগমনের পরের বছর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আত্মীয়-সভার মূল কেন্দ্র ছিলেন রামমোহন। স্বল্পকালের মধ্যে এই সভার সঙ্গে যুক্ত হন কলকাতার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনেকেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নীলরতন হালদার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন জমিদার পরিবারের, অনেকে ছিলেন ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্নেহধন্য বিত্তশালী নতুন ধনিক-কলকাতার পরিবারভুক্ত। আবার এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক স্তরভুক্ত নন। তাঁদের বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক চিন্তা জগতের অভিযাত্রী। এ সভা গঠন ও কর্মসূচী উদ্ভাবন থেকেই অবশ্য হিন্দু সংগঠন।৯(ক) হিন্দুধর্মের প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র, সরল অনাড়ম্বর সাধারণ মানুষের বোধগম্য ঈশ্বর উপাসনা পদ্ধতি নিরূপণ এবং তার প্রচার ছিল এই সভার সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। আচার-সর্বস্ব ধর্মাচরণের বিধি নিষেধ থেকে ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে মুক্তিদান ছিল এই সভার অন্যতম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, আত্মীয় সভার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালনে ও লক্ষ্যে পৌঁছনোর ব্যাপারে খ্রীষ্টধর্মাচরণের সঙ্গে পরিচিত রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ-সভা মূলত হিন্দু সংগঠন কিন্তু একটি বিশেষ সুনির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠী নয়। সকল সম্প্রদায়ের এমন কি বিদেশাগত ব্যক্তিরাও এ সভায় বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। সেদিক থেকে এ সভা ছিল উদার ও প্রাগ্রসর চিন্তাধারার পুষ্ট।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বছর এই গ্রন্থ সংস্কৃত বেদান্তের বাংলা অনুবাদ। বাংলা ও হিন্দী ভাষায় তাঁর বেদান্ত-সার গ্রন্থের প্রকাশও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এতাবৎকাল বেদান্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের একিয়ারভুক্ত ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বেদান্তের যে ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রদান করতেন কলকাতা-সমাজের শ্রেণীর সম্প্রদায় তাই অকাট্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করত। রামমোহন উক্ত অনুবাদ প্রকাশ করে গ্রন্থটিকে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের একচেটিয়া উত্তরাধিকারকে সর্বসাধারণের উত্তরাধিকারে পরিণত করেন, অর্থে বেদান্ত সাধারণ মানুষের বোধগম্য পর্যায়ে পরিণত হল। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির কুক্ষিগত শাস্ত্রের এরূপ মুক্তি স্বভাবতই চিরাচরিত আচার-আচরণ ও সংস্কারে আবদ্ধ কলকাতা সমাজের শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বস্তুত কলকাতায় রামমোহনের স্থায়ীভাবে বসবাস, আত্মীয়সভা গঠন ও বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্রপাত করে এবং কালক্রমে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে ও সমাজ জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়। অবশ্য এই দ্বন্দ্ব ও

সংঘাত নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। কখন ও সংঘাতের মাঝে কখনও মিলনের সুর ও ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে, আবার কখনও কখনও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরস্পর স্থান পরিবর্তনেও দ্বিধা করেনি। ধর্ম, শিক্ষা, আইন, বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, কৃষি রাজস্ব সংক্রান্ত কম্পানী অনুসৃত নীতি ও তার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক বৃটিশ শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা ও কার্যতৎপরতা, খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা, বৃটিশ প্রাচ্যবিদদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তার তৎপরতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাসূত্র তৎকালীন কলকাতা-সমাজের রক্ষণশীল ও সামন্তিক আচার আচরণ ও অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে পারস্পরিক আঘাত-সংঘাতের সৃষ্টি করে। আর এই আঘাত-সংঘাত উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেই যে এই দ্বন্দ্ব ও মিলনের সূত্র নিহিত আছে তা বলাই বাহুল্য।

নির্দেশিকা

১। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃ. ১০-১১

২। Ramkrishna Mukherjee : the Rise and Fall of the East India Company, pp 316-318

৩। Ibid. op. cit. p 330

৪। Quoted by K. K. Dutta, Social History of Modern India, p. 48

৪ (ক)। ,, ,, Ibid op. cit. p 5

৫। Cited by David Kopf : British Orientalism and the Bengal Renaissance, pp 141-142

৬। Ramkrishna Mukherjee : The Rise and Fall of the East India Company, p 421

৭। শাস্ত্রী, op.cit. পৃ: ১৮

৭ (ক)। Ibid, op.cit. পৃ: ১৮-১৯

৮। P. J. Marshall : Problems of Empire Britain and India (1757-1813) p 232

৯। Iqbal Singh : Rammohun Roy, Vol I (The First Phase), pp 121-122

৯ (ক)। Ibid, op. cit. p 123

কেন্দ্রবিন্দু গান্ধী পার্টি নেতৃত্ব ইত্যাদি

অশোক চট্টোপাধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও গান্ধীবাদের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িক বিশ্লেষণেও প্রতিফলিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীকে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি' হিসেবে গণ্য করে তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণের লাইন হাজির করা হয়েছিল। আর এর ফল হিসেবে সুকান্তের মতো কমিউনিস্ট কবির কবিতায়ও অবধারিতভাবে গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণের মূলতঃ অপ্রত্যক্ষ লাইন বেরিয়ে এসেছিল। গান্ধীজীর প্রতি কবিতায় সুকান্তও গান্ধীজীর হাত ধরার বক্তব্য অর্থাৎ পার্টি লাইন প্রচার করেছিলেন। এটা স্পষ্টতই পার্টি লাইনের প্রতিফলন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের, সমকালীন সময়ে, সব চাইতে বড়ো তল্পীবাহক গান্ধীজীর প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রান্ত তথা সুবিধাবাদদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অনাক্রমণ রাখেনি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ভারতের কমিউনিস্টদের বারবার সতর্ক করে দিয়ে কংগ্রেস ও গান্ধীর মতবাদকে কঠোরভাবে সমালোচনা করার কথা বলেছিল। ১৯২০ সালে কমিন্টার্নের প্রথম কংগ্রেস গান্ধীবাদের সমালোচনা করে বলেছিল "ভারতে গান্ধীবাদের মতো প্রবণতাগুলি ধর্মীয় মতবাদে পরিপূর্ণ আপ্লুত হয়ে চরম পশ্চাদ্বর্তী ভাবধারা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক বোধ তুলে ধরে। সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান সর্বহারার সমাজতন্ত্রের মধ্যে না দেখে পশ্চাদ্বর্তী ভাবধারার মধ্যে খোঁজে বলে প্রচার করে। বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচার করে নিষ্ক্রিয়তাবাদ এবং এইভাবে বিপ্লবের বিকাশমান প্রক্রিয়াকে প্রতিক্রিয়ার পথে কলাস্তর ঘটাবার দ্বারা প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। গান্ধীবাদ ক্রমেই বেশী বেশী করে গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে মতবাদ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিউনিস্টকে দৃঢ়তার সাথে এর বিরোধিতা করতে হবে" (বোল্ড আমার অ, চ,)। অথচ এর বিপরীতে গান্ধীজীর প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্ব যে দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত লাইন হাজির করেছিল তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক ও একই সঙ্গে কমিন্টার্নের প্রতি অবিশ্বস্ততাব দর্শিত

পল রিশার গান্ধীজীকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন 'ধরুন, ইংলণ্ডে এক হাজার বিপ্লব দেখা দিল এবং তা থেকে আপনার স্বদেশের স্বাধীনতা এলো! আপনি কি করবেন? গান্ধীজী স্পষ্টতই নিরিধায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন 'আমি বাধা দেবো।' অর্থাৎ গান্ধী বিপ্লবকে বাধা দেবার জন্যই এক প্রতিবিপ্লবী ভাবধারার সক্রিয় সংশোধক। অথচ এই গান্ধী যখন পি, সি, যোশীকে এক চিঠিতে লেখেন যে 'আপনারা হলেন কয়েকজন তরুণ পুরুষ ও মহিলা, আমি যেমন দাবী করি তেমনি স্বার্থলেশহীন', তিনি যখন তাঁদের অর্থাৎ যোশীর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টদের 'পূর্ণবিশ্বাসযোগ্য ও প্রশংসনীয়' বলে মনে করেন এবং 'এই পত্রিকে সহজে হারাতে চান না' বলে লেখেন, তখন গান্ধীপ্রেমে গদগদচিত্ত পি, সি, যোশী বলেন 'গান্ধীজীর কাছ থেকে আমাদের এই পাওনা যথেষ্ট। তিনি হলেন একজন মহাত্মাকারের ধর্মের মানুষ...' শুধু তাই নয়, এরপর আরও এককাঠি এগিয়ে গিয়ে কমরেড পূরণচাঁদ যোশী বলেন যে কংগ্রেস হল **'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রধানতম রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ঐ সংগঠনের সমস্ত স্তরে আমরা গর্ববোধ করছি'** (বোল্ড আমার —অ, চ,)। গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণের ভাষা এর চাইতে আর কি হতে পারে? একই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে নেতৃত্ব 'আমাদের' (কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের) তথা নেতৃত্ব কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে যোশী-নেতৃত্ব 'দৃঢ়সঙ্কল্প'। তাঁরা একদিকে 'গরীব কংগ্রেস' কংগ্রেসের সমস্ত কাজ বরদাস্ত করার কারণে 'ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলধারার সমর্থক' হিসেবে গণ্য করতেন। গান্ধীনেতৃত্বের কাছে যোশীনেতৃত্বের আহ্বান: 'আপনারা নেতৃত্ব দিন আমরা অনুসরণ করব।' এই ছিল গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লববিরোধী মতাদর্শের ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোশীর লাইন। আর স্বভাবতই এই লাইনের অনুবর্তী হিসেবে সুকান্তের 'গান্ধীজীর হাত ধরার প্রস্তাবনা' এই পার্টি-নেতৃত্বের সংশোধনবাদী ভাবধারার অবধারিত প্রতিফলন।

:: দুই ::

গান্ধীজীর অহিংস নীতির পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র সংগ্রামের মতাদর্শ ছিল মূলগতভাবে সঠিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকল্প-

ইন্দ্র মহাভারত হিসেবে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য মূলগতভাবে সঠিক, যদিও সুভাষ ছিলেন মার্কসবাদের প্রতি অশ্রদ্ধাহীন এবং কমিউনিজম তাঁর কাছে ক্যাপীটালিজমের থেকে ভিন্ন কিছু নয়, কেননা উভয়েই সংসদীয় গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে ইত্যাদি। সুতরাং সুভাষবাদের সঙ্গে ঐক্যমতের প্রশ্নের সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করেও একথা বলতেই হয় যে গান্ধীর অহিংস এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহকী রাজনীতির পাশাপাশি সুভাষের সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তাও মূলগতভাবে সঠিক এবং তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমর্থনীয় ছিল। কিন্তু দেখা গেছে গান্ধীবাদের প্রতি আত্মসমর্পিত বোশীয় লাইন সুভাষের এই গান্ধীবিরোধিতাকেও আপেক্ষিকভাবে যুক্তফ্রন্টীয় চিন্তাভাবনার সপক্ষ সম্ভাবনাকেও নাকচ করেছিল। এখানেও যা বড়ো হয়ে উঠেছে তা হলো গান্ধীবাদের কাছে আত্মসমর্পণের সুবিধাবাদবন্ধতার লাইন। আর এই জন্যই বোধহয় মার্কসবাদের প্রতি আস্থাই তথাকথিত সুভাষপন্থী ও 'পথের দাবী'র লেখক শরৎচন্দ্রকে কমিউনিস্ট পার্টি কাছে টানার চেষ্টা করেনি। অথচ এই শরৎচন্দ্রই গান্ধীর চরকা-নীতিকে সরাসরি বিরোধিতা করে দলগত সংগ্রামের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততার কথা অকপটে ঘোষণা করেছিলেন গান্ধীর মুখের ওপর। শরৎচন্দ্রের 'আমাদের কবি' নজরুলের গান্ধী-রাজনীতির প্রতি বিরুদ্ধমনস্কতা এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-র সব্যসাচীর প্রতি আন্তরিকতার সঙ্গে একজন যখন পরবর্তীকালে ভাবালুতার ডুবে যান, তখনও কমিউনিস্ট পার্টির এ ব্যাপারে বাস্তবিক রাজনৈতিকবোধবিযুক্ততার ব্যাপারটা সন্দেহাতীত বলে মনে হয় না। অথচ রবীন্দ্রনাথের মতো মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল কবিকে নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না, এবং আজও কমিউনিস্ট পার্টির (অবশ্যই তথাকথিত 'ডানপন্থী'-দের বাদ দিয়ে) রবীন্দ্রভক্তির অত্যুচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের সমোচীয় প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের রবীন্দ্রভক্তিকেই লজ্জা দিচ্ছে।

গান্ধীর প্রতি পার্টি-লাইনের আত্মসমর্পণের আত্মসমর্পণের কল অনিবার্যভাবেই এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার আপোষমুখীনতার দিকটিকেও অনুন্মোচিত রাখেনি। যার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট লেখকরা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। সুকান্তের কবিতায় মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুঙ্কার শোনা গেছে, শোনা যায়নি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের সমসাময়িক কালে যখন জাপানী ফ্যাসিস্টরা বর্মা সীমান্তের কাছাকাছি, সে সময় পার্টি-লাইনের ফ্রেঞ্চাইজমার ফল হিসেবে দেখা গেছে ফ্যাসী বিরোধী যুদ্ধপ্রয়াসের সহযোগী লাইনের আমদানী করতে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রয়াসের নেতৃত্ববৃত্তি শুরু হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে চিহ্নিত করা হল পশ্চাদবাহিনীর কাজ বলে। পার্টি লাইনের এই কার্যকাণ্ডের ফলশ্রুতি সুকান্তের মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধনির্ঘোষ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নীরবতা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও এ ব্যাপারে স্বীকার করেছেন 'আমাদের এই সময়কার গানে কবিতায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকতো না।' তখন জাপানী ফ্যাসীবাদের সঙ্গে সবকিছুকে 'link up' করতে হবে—এই ছিল পার্টির লাইন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় লিখলেন: যুদ্ধ-ঘণ্টা তোলো আওয়াজে / ওপরে যুদ্ধাকাশে আজ…/ আমরা নইকো তীরুর জাত/দেবো নাকো হতে দেশ বেহাত…'। এখানে স্পষ্টতই 'যুদ্ধরব' হল জাপানী ফ্যাসিস্ত বাহিনী। অর্থাৎ পার্টি লাইনের ফলশ্রুতি। 'দেবো নাকো হতে দেশ বেহাত'—অর্থাৎ জাপানী ফ্যাসিস্তদের হাতে দেশকে 'বেহাত' হতে দেওয়া হবে না, অথচ প্রায় ২০০ বছর ধরে তখন দেশটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে 'বেহাত' অবস্থায় পড়ে রয়েছে! বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে দেশটা 'বেহাত' থাকাটাকে তখন 'বেহাত' বলে না ভাবাটাই ছিল পার্টিলাইনের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ স্পষ্টতই গান্ধীর সঙ্গে আপোষমুখীনতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ববৃত্তি করার বাস্তবতা, যা কিনা পার্টিলাইনের ফলশ্রুতি।

॥ ৩ ॥

১৯৪৭-এর আগষ্টের ১৫-তে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোশীয় দালালদের এক ঐতিহাসিক চুক্তিনামার ফলশ্রুতি হিসেবে এলো তথাকথিত 'স্বাধীনতা'। আর কংগ্রেসের সঙ্গে ঐ দিন পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করতেও কমিউনিস্ট-নেতৃত্ব পিছপা হয়নি। আর আজও তো প্রকাশ্যতই তল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ববৃত্তির মধ্যে দিয়ে, বোশী সহযোগিতার লাইন কায়েমের মধ্যে দিয়ে, সংসদের গলিতে লাইন দেবার মধ্যে দিয়ে 'স্বাধীন' ভারতে একের ভেতর তিন কমিউনিষ্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্রুশ্চেভীয় ভাবধারা নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। যাই হোক পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

যে গান্ধীর প্রতি পার্টি লাইন অমন আপোষমুখীনতার দৃষ্টান্ত রেখেছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ববৃত্তির স্বার্থে সুভাষ বোসকে 'তোজোর কুকুর' জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত করেছিল, সেই গান্ধী সম্পর্কে মূর্খোদ্ধা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যটা একবার দেখা যাক: '…আমার মতে ভারতের মুক্তিলাভের কৃতিত্ব একমাত্র—এমন কি, প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য এই মতে প্রচারিত মত ও সংস্কার সম্পূর্ণ

ভ্রান্ত' (বোল্ড আমার—অ. চ.)। তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন '১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হওয়ার পরে গান্ধী ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আর কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই' (বোল্ড আমার—অ. চ.)। ১৯৩০ সাল—সময়টা লক্ষণীয়। এছাড়া লর্ড অ্যাটলীকে ১৯৭৬ সালে ভবিষ্যদ্বক্তা ৮০বর্ষী মহাত্মা জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল?' এ প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ অ্যাটলীর 'প্রচণ্ড একটা অন্তর্জ্বালার হাতে বিদ্ধ হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন 'm-i-n-i m-u-l' অর্থাৎ ঐ গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস সম্পর্কে মোটা মোটা বক্তব্য ছিল : গান্ধী 'হলেন একজন সাংবাদিকের মতন মানুষ...তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আমরা ভয় করে গেছি। এখন তাঁর বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভাল যে, আমাদের উপস্থিতি বোঝাতে ও পরিচালিত করতে আর দরকার হলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না.... আপনারা হলেন আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক মেরুদণ্ড। ঐ মেরুদণ্ডের সরল হয়ে আমরা চরিত্রের অর্থাৎ ... আমাদের সংগ্রাম হল কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট ঐক্যের।... আপনারা হলেন ভারতের মানুষের। কংগ্রেসের মেরুদণ্ডের মেরুদণ্ড আপনাদের শক্তি-মাটি করতে আমরা চূড়ান্ত। আমরা সকলেই গড়ের সঙ্গে কংগ্রেস কাজ করে চলেছি...আপনারা মেরুদণ্ড ঠিক আমরা অনুসরণ করব...।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহার : ভারতের আজও কোনো চরিত্র কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠতে দেয় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দর্শন

মিহির আচার্য

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিতির কারণে এদেশে গ্রামত্বত্ত্ব ও ধনতন্ত্র, গ্রামীণ ও নাগরিকতা বিদেশিদের আমাদের জীবনযাত্রা ও ধ্যান-ধারণাকে আধাখেচড়া করে রেখেছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও না-সমাজজীবনে না-মানসিকতায় গুণগত আমূল পরিবর্তন কিছু ঘটেনি। অভাবধি আপাতবিপরীত দ্বৈতসত্তা আমাদের কর্মে-চিন্তায় প্রকট হয়ে আছে।

একজন প্রধান লেখক, লেখার 'জীবনায়নই' যাঁর লক্ষ্য, তাঁর পক্ষে এই দ্বৈপরীত্যের শিকার হওয়া স্বাভাবিক। তাঁদের রচনায় তথাকথিত গ্রামীণতা ও নাগরিকতা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে। এবং এর জন্যে তাঁর কোনো গ্লানিও লক্ষিত হয় না। বরং তুলনা করলে গ্রামীণ-চিত্রের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত অধিক দৃষ্ট হয়। এই সংস্কারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কলোনিয়ালজাত প্রতিক্রিয়ায় অটুট 'কিউরাল' ধ্যানধারণা লেখকের রক্তে-মাংসে-মজ্জায় মিশে গেছে, অচেতন এবং সচেতনভাবেও তিনি এর থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনায় গ্রাম্য-আবহ বহুলাংশে জুড়ে রয়েছে। নাগরিক-পরিমণ্ডল তুলনায় কম হলেও তাঁদের গ্রামজীবনের প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। একে যদি গ্রামপ্রেম বলে আখ্যায়িত করি তাহলে স্বীকার করতেই হয় এটা কিউরাল সংস্কারেরই পরিণাম।

এখানে প্রশ্নটা থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের গ্রাম-জীবন একই দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় উপার কৃষিজীবীর মানসিকতার সঙ্গে নিসর্গ ও গ্রামের নরনারী একই কাব্যিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ-দৃষ্টিভঙ্গি 'রিয়ালিস্টিক' ইকনমিক নয়। অন্য দিকে শরৎচন্দ্রের গ্রামীণ-আবহাওয়ায় নিজস্ব বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কখনো কিউরাল সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রামে আপসে সমকালের-প্রশ্নগুলিকে বিদ্ধ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিচারে সমাজবিন্যাসের এই আধাখেচড়া প্রকৃতিকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। প্রধান লেখকদের মতোই তাঁরও মনোলোক না-গ্রাম্য না-শহুরে ঘিরায় পীড়িত হতে বাধ্য। কারণ সমরের হিসাবে কিউরালিজম্-এর বয়স অনেক, অপুষ্ট ক্যাপিটালিজম্ ঔপনিবেশিক কারণে এবং গুণগত মৌলিক পরিবর্তনের অভাবে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মানসকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। ফলত, মানিকবাবুর আদিপর্বের সৃষ্টিতে 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথায়' কিংবা উত্তরকালের গল্পপ্রবাহে গ্রামজীবনে প্রচুর পরিমাণে অধিকার করে রয়েছে।

কিন্তু যে-জিনিসটা মানিকবাবুর সমালোচকেরা এড়িয়ে গেছেন সেটি এই যে, গ্রামীণ পরিবেশ হাজির করলেও লেখক গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নন। কথাটা একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে। অর্থাৎ কী-গ্রাম কী-শহর চালচিত্র রচনায় মানিকবাবু অনন্যতা মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতা, যা সমাজ বিন্যাসের জটিলতার শিকার এবং সে অর্থে 'আর্বান' তা কাজ করছে। আরো সহজ করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় লেখকের নিজস্ব দার্শনিকতা, যা মানসিক গঠন এবং অভিজ্ঞতার যোগফল, তার নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবয়ব পেয়েছে। সে-অর্থে 'পদ্মানদীর মাঝি' কিংবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' গ্রাম্য রচনা নয়। মানিকবাবুর জীবনদর্শন কী-গ্রাম কী-শহর কী-গ্রামজীবনে অভিজ্ঞ লেখকসত্তারই পরিচায়ক।

এমনকি মার্কসীয় দর্শনে অভিষিক্ত তাঁর উত্তরকালের গল্পপ্রবাহ পর্যন্ত গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। সেখানে স্পষ্টতই তিনি মার্কসীয় দর্শনকে পিছিত প্রয়োগ করেছেন।

তাঁর সমসাময়িক বড় লেখকদের মধ্যেও, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এই দার্শনিকতার অভাবে, রচনায় গ্রামজীবন চিত্রণে বহুমুখী টাইপ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও লেখকের বিশিষ্ট জীবনদর্শনের পরিচয় মেলে না। আমাদের বিবেচনায় লেখকের নিজিষ্ট জীবন দর্শন ব্যতিরেকে সাহিত্য সমর্থে জীবনভাষ্য হয়ে ওঠে না। এর জন্যেই 'রাইটার' এবং 'আর্টিস্ট' এক জাতের নয়। ইংরেজি সাহিত্যে টমাস হার্ডি সেই জীবনদর্শনের কারণেই বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্টতার অধিকারী। তাঁর 'রিটার্ন অব দি নেটিভ', 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড' জাতীয় রচনাগুলির বাতাবরণ গ্রামীণ হলেও লেখকের 'ক্যারেক্টার ইজ ফেট' দার্শনিক আলোকে তা তথাকথিত গ্রাম্য হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু সমালোচক, যাঁদের মধ্যে প্রগতিশীলরাও আছেন, একবাক্যে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে বাস্তব মাঝিদের জীবন হাজির হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন, বিশেষ করে হোসেন মিয়ার চরিত্রের অবাস্তবতা সম্পর্কে

মন্তব্য করেছেন। তার কারণ তাঁরা দার্শনিক স্রষ্টার কাছে নিছক গ্রাম্যজীবনের ফোটো-গ্রাফি আশা করেছিলেন। সমালোচকেরা শিল্পীর 'আবশ্যিক জীবনদর্শনের' ব্যাপারটা বিস্মৃত হন। জগতে কালজয়ী রচনা মাত্রই দার্শনিক উপলব্ধির জোরে টিকে আছে। নিছক 'বাস্তবতা' কিংবা 'কাহিনী' বেঁচে থাকতে পারে না। গ্রীক ট্রাজেডি, শেকসপীয়র, টলস্টয়, হার্ডি জীবন নিষ্কাষণ করে যে দার্শনিক সত্য, প্রচার করেছেন তা উজ্জ্বল উত্তরাধিকার হয়ে আছে। প্রসঙ্গত মানিকবাবুর আদিপর্বের অবিস্মরণীয় 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি নামকরণ থেকে শুরু করে উপসংহার পর্যন্ত যে-ব্যঞ্জনা বহন করে, তুলনামূলকভাবে যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালি'র সঙ্গে বিচার করলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

সাহিত্যের চরিত্র-লক্ষণ বিচার করলে দুটো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এক জাতীয় রচনা ঘটনা, চরিত্র প্রধান, সেখানে একটি নির্দিষ্ট প্লট আছে, যেখানে পাঠক একটি ধতুর্লি কাহিনীও বাড়তি পেয়ে যান। আরেক জাতীয় রচনা আবিষ্ক্রিয়ার মতো। অনুসন্ধান-পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের বিশেষ মানসিকতার সহযোগে 'নতুন ভুবন' গড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ের রচনাকে যদি 'সাহিত্যকর্ম' আখ্যা দিই, দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা চলে 'সৃষ্টিকর্ম।' দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখক নিছক সাহিত্যিক নন, তিনি স্রষ্টা এবং দার্শনিকও বটে। স্রষ্টা লেখকদের রচনা চিরায়ত মর্যাদা পেলেও স্বীকার করতে হয় তাঁদের পাঠক সীমাবদ্ধ, প্রায়ত সার্বজনীন জনপ্রিয়তা তাঁদের অর্জন করা সম্ভব নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্রষ্টা, দার্শনিক লেখক। প্রগতিশীল মহলে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ স্রষ্টা পরিচিতির জন্যে নয়, তাঁর সাম্যবাদী বিশ্বাস তথা উত্তরকালের গল্পগুলির জন্যে। আমাদের বিবেচনায় কোনো লেখককে খণ্ডিতভাবে বিচার করা যায় না। তাহলে তাঁর এককালের সাহিত্য-কৃতিকেই অস্বীকার করতে হয়। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় প্রগতিমহলে মানিকবাবুকে খণ্ডিতভাবে বিচার করার একটা রেওয়াজ আছে। যা আমাদের ধারণায় সত্য হতে পারে না।

আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি যে মানিকবাবু প্রথমাবধি এক জাতীয় দার্শনিকতা নিয়েই সাহিত্যের সংসারে নেমেছেন। সে-দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল মনে হলেও সমালোচক হিসেবে আমাদের তার মূল্যায়ন হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক দর্শন পাকাপাকি আয়ত্ত করবার আগেই তাঁর রচনার মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ ধরা পড়ে যেখানে তথাকথিত উচ্চবিত্ত, চরিত্র 'ভদ্রলোকী' জীবনের বিরুদ্ধে আক্রমণ অনীহা এবং নিম্নবিত্ত, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যা তাঁর স্বভাবে ধরা মানসিকতার সঙ্গে মিশে গেছে। মানিকবাবু প্রথমাবধি নিজেকে শ্রেণীচ্যুত, রাজনৈতিক পরিভাষায় declassed করেছেন। মার্কস-বাদী বিশ্বাস তাঁর পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। বুর্জোয়া লেখকদের মতো কোনদিনই নিজেকে তিনি সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত করেন নি। ক্ষমতা প্রধান লেখক হওয়া সত্ত্বেও কেরিয়ার তৈরির বাজা না করে দেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্যকেই বরণ করে নিয়েছেন। দারিদ্র্য বিলাস নয়, এটা তাঁর জীবনভঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বুর্জোয়া 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' দর্শনকে পরিহার করে তিনি যখন মার্কসীয় দর্শনের 'সমষ্টিগত' প্রত্যয়ে পৌঁছলেন সে সময়ের রচনার মধ্যে দেখা যাবে তিনি স্রষ্টার আসন থেকে নেমে ছকবাঁধা শ্রেণীসংগ্রামের স্লোগান উদ্গার করেন নি। এমনকি রবির আলি দিবসের কাহিনী (চিহ্ন) কিংবা যে-ভাষা যুদ্ধ-বিষয়ক বিষয়ক গল্পগুলিতে এমনভাবে তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়কে প্রয়োগ করেছেন যে তথাকথিত 'সাধারণ' মানুষগুলো 'অসাধারণ' হীরো হয়ে উঠেছেন। তাঁদের Commonsense un-commonsense-এ পর্যবসিত হয়েছে। ছোট বকুলপুরের যাত্রী, সাড়ে তিনটি, চারাগাছের মাত-ব্বার, যাকে পুষ দিতে হয়, প্রীত শীর্ষক গল্পগুলি স্রষ্টাধর্মের জন্য মনে রাখা যেতে পারে। আমাদের বিবেচনায় দর্পণ ও শিল্পিমানসের দুর্লভ্যিক সার্থক মার্কসীয় সাহিত্যের পথ-নির্দেশ করছে। মন্বন্তরকালে কোনো সমা-লোচক তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে মানিকবাবুর যথেষ্ট অভিনন্দন না জেনে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এমনকি গল্পগুলিতে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করবার প্রয়াসও দেখতে পান নি। সমালোচকের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি যান্ত্রিক বিচার বলে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রীতে' চাষীর তথাকথিত Commonsense কীভাবে বর্বর রাষ্ট্রনৈতিক পাশবতার দলন নিপীড়নের চেতনে সমস্ত করল গল্পের এই অনবদ্য চেতনা কী সংগ্রামেরই দ্যোতক নয়? আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশ না নিলেও মানিকবাবু কেমন চাষীজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, যার ফলে চাষী-মনস্তত্ত্ব অবিকল সত্যের মধ্যে হাজির করেছেন মরমী লেখক। কোনোদিন চাষীদের জীবনে শিকার আলোক প্রবেশ করলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা মানিকবাবুর মধ্যে তাঁদের আত্মীয়কেই আবিষ্কার করতে পারবেন। এবং চাষীরা মানিকের সাহিত্যে আত্মদর্শন করে নিজেদের হীনমন্যতা কাটাতে পারবেন। যেহেতু আমাদের স্থির বিশ্বাস মনে প্রাণে চাষী বনে' গিয়েই লেখক তাঁদের দৌর্যবীর্য, সরলতা, বিশ্বাস, শুভবুদ্ধি, ক্ষমির ক্ষুধা—সমূহ মনস্তত্ত্বকে বিকশিত করেছেন। রাজনৈতিক সংগঠনের যথাবিহিত অবস্থান, তাবাবেগ কিংবা শুভবুদ্ধি দিয়ে তিনি এই জীবনকে দেখেন নি।

প্রসঙ্গ ঃ সজনীকান্ত দাস

রণজিৎকুমার সেন

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র প্রথম খণ্ডের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন :—"বঙ্গশ্রীর এক বর্ষে চৈত্র (১৩৩১/১৩৩২) সংখ্যায় 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' লিখিয়াছিলাম। এই লেখাটি রঙ্গলক্ষ্মী মিলের স্বনামধন্য সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে। তিনি তখন 'উপাসনা' প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করিয়া সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্নের সহিত যুক্তযোগে 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে চালিয়া সাজিবার মতলব করিতেছেন। উক্ত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গের' অন্তর লেখককে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই তিনি আমাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'উপাসনা'র সম্পাদক ও বেঙ্গলী পলিটান প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। 'উপাসনা'র নাম বদল করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখি এবং ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর হইতে ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফাল্গুনী পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর দুই মাস কাল ওই কার্য করিয়া শেষে মতান্তরের জন্য কাজ ছাড়িয়া দিই।"

এর অব্যবহিত কাল পূর্বে নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠি'র পূর্ণ স্বত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করে তিনি শনিরঞ্জন প্রেস ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রতিষ্ঠা করেন। 'বঙ্গশ্রী'র সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তিনি সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনার ভারিত্ব অর্পণ করেন পরিষদে সোমাদীর উপর। তার উদ্যোক্তা ছিলেন 'বানরী গার্লস স্কুল' খ্যাত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের অকাল মৃত্যু সে সময়ে সজনীকান্তের মতো আমাকেও শোকাচ্ছন্ন করে। কারণ তিনি ও আমি উভয়েই ছিলাম ফরিদপুর জেলার মানুষ। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে সজনীকান্তের বেদনাবিধুর রচনা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যার অন্যতম লেখক ছিলেন তিনি। সজনীকান্তের পর কিরণকুমার রায়, বিজয়রত্ন মজুমদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'বঙ্গশ্রী'র বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদনার কাজে যুক্ত থাকেন। আমার নিজের সম্পাদনাকাল ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। এই সময়েই কর্তৃপক্ষের আকস্মিক ঘোষণায় 'বঙ্গশ্রী'র প্রকাশ চিরকালের মতো বন্ধ হয়। দীর্ঘ এক যুগ আমাকে 'বঙ্গশ্রী'র যাবতীয় কাজ একা হাতে সম্পাদন করতে হয়। সাংবাদিক জীবনে 'নবযুগ'-এর পর এ যুগটি আমার স্বর্ণ যুগ বলা যায়। অকস্মাৎ একদিন সজনীকান্ত আমার দপ্তরে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন : 'বঙ্গশ্রীর সূচনায় এসেছিলাম আমি, আর পরিণতিতে তুমি ; আমাকে আর তোমাকে নিয়েই একটা বিশেষ ইতিহাস তৈরী হতে পারে। কারণ আমরা এখন কিছু প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যিক ও অসাধারণ সাহিত্য পরিবেশনের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে যেতে পেরেছি —যা একদিন গবেষণার বিষয় হবে।'

হেসে বললাম : 'আপনার দু'বছর দু'মাসকে আমি বারো বছর দিয়েও কভার করতে পারছি না। ১৯৩২-৩৪ আর ১৯৪৩-৪৪'র মধ্যে যে ব্যবধান, তা ইতিহাসের দিক থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপ্রধান। আপনার কালটা ছিল ভিলেচালা শান্তির কাল, আর আমাকে নিতে হলো গোটা বিশ্বের বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশভাগকে।'

সজনীকান্ত বললেন : 'এখানে তোমার কাজের কোনো তুলনা নেই। শনিবারের চিঠির সূচনা শতবর্ষী ছত্রিশের এলুসের গুরুচালের কাজটা আমাকে খুব বেশী শর্শ করেনি। তোমার এ সময়কার সম্পাদকীয় প্যারাগ্রাফগুলো যেমন সিরিয়াস, তেমনি ইলাবোরেট।'

বললাম : 'আমি জানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে আপনি হয়তো বঙ্গশ্রীতে আর লিখতে রাজি হবেন না, নইলে বলতাম মাঝে মাঝে কিছু লেখা দিন। আপনি ছাড়া প্রায় সবাই বঙ্গশ্রীতে লিখছেন। এখানে আমি রায় ও হক্সিল এককণে মিলিয়েছি।'

সজনীকান্ত বললেন : 'এটা তোমার অসাধারণ ক্রেডিট।'

বললাম : 'তা জানি না, তবে এরজন্যে আমাকে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। এইটেই আমার কাজের সুবিধে। আমি জানি—যুগকে এড়িয়ে যাওয়া মানে আত্মঘাতি হওয়া, বঙ্গশ্রীর মালিকপক্ষ অন্তত: তা হতে চাইবেন না।'

একটুকাল থেমে কি ভাবলেন সজনীকান্ত তারপর বললেন : 'শনিবারের চিঠিতে কবে যাচ্ছো? সঙ্গে লেখা নিয়ে যেয়ো।'

বলতে বাধা নেই যে, এ সময়ে আমি অন্যান্য পত্রপত্রিকার মতো শনিবারের চিঠিতেও মাঝে মাঝেই গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতাম। সজনীকান্ত উপযাচক হয়ে তার প্রশংসা করতেন। বললাম : 'যাবো, খুব শীগ্‌গিরই যাবো ; সাহিত্য পরিষদের পাবলিকেশন সম্পর্কেও আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো।'

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই তাঁর শনিরঞ্জন প্রেসে ছাপা হতো।

সজনীকান্ত বললেন : 'ঠিক আছে, তাই এসো।' ব'লে আর একটুকালও অপেক্ষা না ক'রে ভিতর কাছে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

সজনীকান্তর সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ আলাপ ১৩৩৯ সালে ফরিদপুর অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত স্থানীয় রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হ'য়ে যোগ দিলেন সজনীকান্ত দাস ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। আমার লিখিত দীর্ঘ ভাষণ উদ্যোক্তারা বুদ্ধিতাকারে প্রকাশ করেছিলেন। আমার পাঠের পর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করেছিলেন সজনীকান্ত। কিন্তু পরবর্তী ট্রেনে কলকাতায় রওনা হতে হওয়ায় আলাপ বেশীদূর গড়ালো না। সেদিনের মতো থেকে গেলেন বিজয়লাল। পরের দিন তাঁকে নিয়ে শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে বহু আলোচনা ক'রে আনন্দ পেলাম। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে সজনীপ্রসঙ্গও ছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে প্রথম তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয় বোধ করি নৈহাটীর বঙ্কিম-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে। তাঁর আমন্ত্রণেই পরে মোহনবাগান রো'তে শনিবারের চিঠির আড্ডায় দু'একবার মিলিত হই। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গশ্রীতে মাঝে মাঝে দু'একটি গল্প লিখলেও শনিবারের চিঠিতে তখনো লিখিনি। লিখি আরও বহুকাল পর থেকে। তখনই অনুভব করি—কী অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ তিনি! 'প্রবাসী'র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি' যোগানন্দ দাসের সম্পাদনার পর এসে স্থান হ'লো সজনীকান্তের হাতে, এবং শেষ পর্যন্ত পুরো মালিকানা সত্বটাই এসে গেল। তার সঙ্গে সংযোজিত হ'লো মুদ্রণ ও প্রকাশন। যদি এই সংযোজন সেদিন না ঘটতো, তবে হয়তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' যোগ্য প্রকাশকের অভাবে আরও দীর্ঘকাল এন্থাকারে রূপ না পেয়ে মাসিক 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকতো! নিজের আর্থিক অভাব নিয়েও সজনীকান্ত বিভূতিভূষণকে অগ্রিম রয়্যালটি দিয়ে তাঁর 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। বিভূতিভূষণের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে। সজনীকান্তর এজাতীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মের কোনো তুলনাই ছিল না। সেই সঙ্গে তাঁর গবেষণা, সম্পাদনা ও সমালোচনা ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও বস্তুবাদ। এসব আমাকে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করতো।

পরবর্তীকালে আমার প্রথম উপন্যাস 'চক্রবাকী' আমি সজনীকান্তকেই উৎসর্গ করি। উপন্যাসটি ইতঃপূর্বে 'সৈনিক' নামে 'বঙ্গশ্রী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। '৭১-এর আন্দোলন থেকে শুরু ক'রে আই-এ এ মুক্তফ্রন্ট পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসটি রচিত। এ সময়ে আমার 'সমাজ-দর্শন' প্রবন্ধের বইটিও প্রকাশিত হয়। কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে এ দু'খানি বই-য়েরই সমালোচনার ভার পড়ে সজনীকান্তের উপর। নির্মম সমালোচকের কণ্ঠে যে-ভাষণ গ্রন্থ দু'টির যে তুমুল প্রশংসা ধ্বনিত হয়, তার স্বাক্ষর রয়েছে তখনকার বেতারকথার পাতে। সাক্ষাৎমতো একদিন সজনীকান্ত বললেন : 'গল্প, উপন্যাস ও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত তুমি যে সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখছো, এতে তোমার খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য একদিন সারা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

বললাম : অগ্রজের এতো শুভেচ্ছা নয়, এ আশীর্বাদ। চিরকাল মনে থাকবে।'

মনে পড়ে, এরপরের কিছুকালের মধ্যে ত্রিপুরা সম্মেলনী কর্তৃক মহাবোধি সোসাইটি হলে 'শরৎ জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হ'লো। সভাপতি—সজনীকান্ত। আমি কিছু বলবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সভাপতির শরৎ-চন্দ্রবিষয়ক প্রারম্ভিক ভাষণ আমার মনঃপূত হলো না। আমি বলতে উঠে তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। সজনীকান্ত নতুন ক'রে আমার ভাষণ দিতে উঠে আমার প্রতিবাদ খণ্ডন করবার সুযোগ দিলেন এবং অনুষ্ঠানের শেষাংশে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন : 'তুমি খুব ভালো বলেছ, আমি খুব appreciate করেছি।'

এ রকম ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর হলেও জীবনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাণবান পুরুষ। তাঁর কাছে সাহিত্যের তর্ক এবং অন্তরের প্রীতি একই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

মহাবোধি সোসাইটি হ'লে পর-পর কয়েক বছর আমার গান নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর পরিচালনায় 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সজনীকান্ত ও পৌরোহিত্য করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে সজনীকান্ত আমার গানের বাণীগুলো নিয়ে যেভাবে ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে বক্তৃতা করলেন, তা বোধকরি একমাত্র সজনীকান্তের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি নিজে ছিলেন গীতিকার, গানের অর্থ পেলে মধুপের মতো মন তাঁর মেতে উঠতো, বুঝে প্রশংসা করতো না। সেই প্রশংসার অনেকখানি অংশ সেদিন আমার ভাগ্যে এসে জুটেছিল। তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা পেয়েছিলাম স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কাছে। আমার সঙ্গীত রচনার সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন সমস্ত অন্তর জুড়ে।

পরে আমি যখন সংক্ষিপ্তাকারে 'রৌদ্র দর্শন' এই রচনা করি সজনীকান্ত তখন আমাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থখানি উপহার দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। আমার 'বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থের দু'একটি অধ্যায় ইতি-

দেড়শ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল

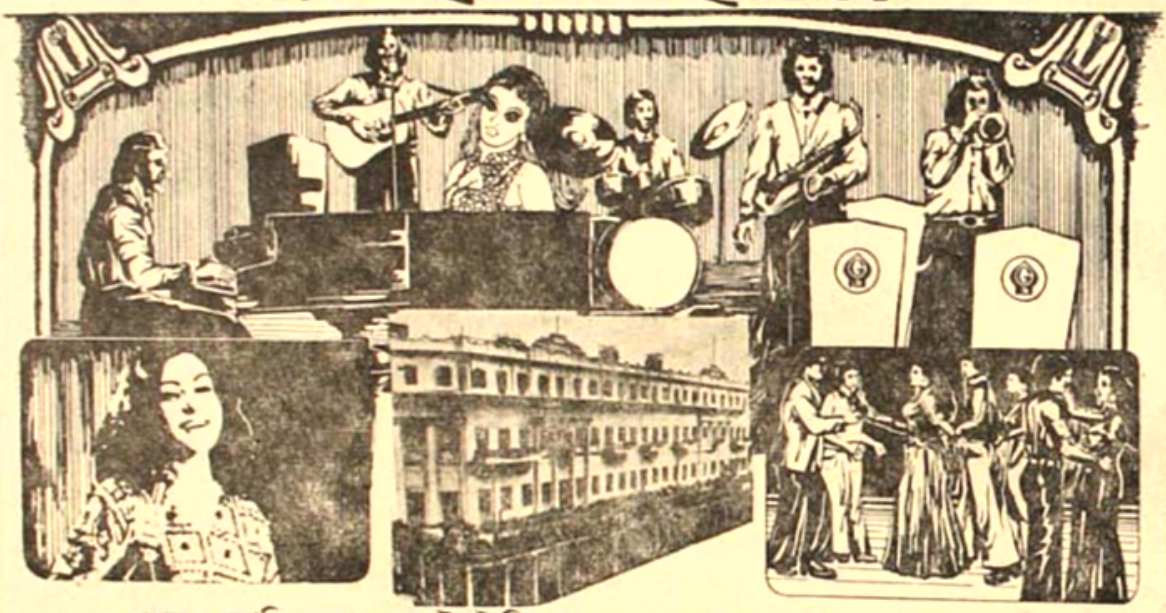

এখনও আতিথেয়তার সেই ট্রাডিশন বজায় রেখে চলেছে
নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীতের তানে তানে....
স্বপ্নময় পরিবেশে সুস্বাদু খাদ্যের জন্য
MAXIM'S Restaurant

GREAT EASTERN HOTEL
A NATIONALISED HOTEL
Phone 23 23...
23 23... 23 29...

পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তেই মুদ্রিত হয়। গ্রন্থপ্রকাশের পর একদিন তাঁর টালার বাড়ির পোষার ঘরে ব'সে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি রজনীকান্তর সঙ্গে গল্প করছি। তারাশঙ্কর লন্ড তখন বেনারস ঘুরে এসেছেন, বেনারসেরই গল্প হচ্ছিল। মাঝখানে একবার এসে আমাদের সুধা বৌদি চা পরিবেশন ক'রে গেলেন। চা খেকেই গল্প সাহিত্যে মোড় ঘুরলো। তারাশঙ্কর নতুন কি উপন্যাস শুরু করেছেন—কথা উঠতেই তারাশঙ্কর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি এখন কি লিখছো রণজিৎ?'

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চমকে দিয়ে রজনীকান্ত হঠাৎ বলে উঠলেন: 'রণজিৎ অনেক সিরিয়াস কাজ করছে। বৌদ্ধদর্শন শেষ ক'রেই বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একখানি দারুণ বই লিখেছে।'

এমনি মানুষ ছিলেন রজনীকান্ত। যখন যার রচনা ভালো লেগেছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে বড় গলায় তিনি তা প্রচার করেছেন। তেমনি নির্দাক্ষিণ্যে নিন্দাও করেছেন তিনি অকপটে। তার নিদর্শন রয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিটি সংখ্যায়। তাঁর জন্মদিনের আসরও ছিল তেমনি সাহিত্যেরই আসর। একবার এরকম একটি আসরে বসে আলোচনাসূত্রে রজনীকান্তকে বললাম: 'যাদের বিরুদ্ধে এতকাল ধরে আপনি শনিবারের চিঠিতে লিখছেন, তারাই কিন্তু বাজারে ভরে গেছে। লিখে লিখে আপনি বরং তাদের সুবিধেই ক'রে দিচ্ছেন।'

শুনে পাশাপাশি বসে মৃদু টিপে হাসতে লাগলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যাঁর গল্প উপন্যাস, কৃষ্ণনগর যে প্রতিটি। রজনীকান্ত বললেন: 'মহাকাল বড় কঠিন বিচারক, একালের আবের যা পশুশ্রমটি ভবিষ্যতে সে নির্মমভাবে বাতিল ক'রে দেবে। সেদিন মহাকালের কাছে আমার আজকের এই সমালোচনাগুলো হয়তো বিশেষ কোনো শিরোপাও পেয়ে যেতে পারে।'

একবার পর সেদিন আমার আর দ্বিতীয় কোনো বক্তব্য ছিল না, তাঁর জন্মদিনের আহারের পরিতৃপ্তি নিয়ে একসময় উঠে এলাম।

আর একদিন তাঁর শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত 'আমার সাহিত্য' নিয়ে কথা হচ্ছিল। রজনীকান্ত বললেন: 'জানো রণজিৎ, এতদিন লিখতে লিখতে এখন মনে হচ্ছে—আমার সাহিত্যের কোনোরকম একটা

বিশেষ চরিত্র নিয়ে ফুটে উঠেছে। অনেক দিনের লেখা থেকে বাছাই ক'রে যদি 'সোপানিকা' নাম দিয়ে একটা বই করি, তবে বাংলাসাহিত্যে একটা স্থায়ী মর্যাদা পেতে পারে।'

বললাম : 'করুন না, খুবই ভালো হবে।'

কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে কাজে আর হাত দিতে পারেন নি তিনি। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো, রচনার কাজ প্রায় বন্ধই হতে চললো। এর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তিনিই প্রথম শনিবারের চিঠিতে আমাকে 'সাহিত্যের সর্বনাশী' সম্বোধন করে আমার 'দ্বৈতসঙ্গীত' উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যখন আমার বিরোধ ঘটে, তখনও তিনি তার সেক্রেটারী, কিন্তু সে বিরোধ তাঁর ও আমার মধ্যে কখনো কাটল ধরায়নি, বরং কোনো কোনো বিষয় আমার অনুকূলেই এসেছে। তাঁর মধ্যে সব সময় এক বিশেষ দৈত সত্তা কাজ করতো : সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে অনেক সময় বিরুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অথচ ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে তাঁর অতিবড় শত্রুকেও দেখেছি তাঁর সৌহার্দ লাভে ধন্য হতে। এমন একজন ব্যক্তিস্বসম্পন্ন পুরুষ সাহিত্য জগতে আমার খুব বেশী চোখে পড়েনি। আমরা উভয়েই কৃষ্ণ নদের মানুষ। তাই বোধ করি তাঁর ও আমার সাংস্কৃতিক কর্ম আগে পরে প্রায় একই খাত ধরে চলেছিল। আমার প্রতি তাই শুধু তাঁর স্নেহই ছিল না, দাবীও ছিল অনেক।

তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, ব্যঙ্গশিল্পী, ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও গবেষক। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আত্মস্মৃতি, অন্তর, পশ্চিমে বৈশাখ, মানস সরোবর, রাজহংস, কলিকাল, কেতু সং ও ভাঁওতাল, ভাব ও রূপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অনুবাদ সাহিত্য, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা ও বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা রচনা সজনীকান্তের জীবনের এক অনন্য কীর্তি। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত রচনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু জীবনের শেষার্ধে গবেষণাবৃত্তি তাঁর অপরাপর মৌলিক রচনাকে প্রায় ম্লান করে দিয়েছিল। রবীন্দ্র-বিরোধিতার ধ্বজা নিয়ে রবীন্দ্র-স্নেহে ধন্য হবার মতো এমন ব্যক্তিপুরুষও ছিল বিরল। অনেক সময় সজনীকান্তকে সমালোচনা করতে গিয়ে অনন্যে তাঁর প্রশংসাই করেছি। সংস্কৃতি জগতে তাঁর মতো ক্ষমতাবান পরোপকারী সুহৃদও খুব কমই দেখা গেছে। তাঁর জীবনে নদীর প্রভাব ছিল অসাধারণ। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন —

—'...অনেকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। ভরাডুবির শীতে-ঈর্ষতোয়া এবং বরষার-দু'কূলপ্লাবি অন্তর, বালকদের মৃদুমৃদু-কলস্রোতা মহানন্দা, বাঁকুড়ার জচি-ঘুমুর্ জচি-ভীষণ দ্বারকেশ্বর এবং তাহার নিত্যসঙ্গিনী বালুবাহুরক্তা গন্ধেশ্বরী, পাবনার পারাপারচিহ্নহীন সুবিপুলা তরঙ্গবতী পদ্মা এবং দিনাজপুরের পল্লীবধূর মত শান্ত নিরলঙ্কার নিরহঙ্কার কাজল—ইহাদেরই কূল অথবা কীল ধারার নিকটে আমার মনের কাব্যরস পিপাসা আষাঢ়া শুধু মিটে নাই, আমার কাব্যজীবনের সহিত তাঁহারা ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সূতিয়া হইতে টাঁয়ারে প্রথম পদ্মা পাড়ি দিয়াছিলাম শৈশবের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে। পরদিন রৌদ্রালোকিত প্রভাতে কূল ভাঙনের মাঝে ভাঙাইয়া পদ্মার যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা আজও আমার স্মৃতিতে জলজল করিতেছে। পাবনা হইতে দিনাজপুর যখন যাই, তখন সবে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সারারাত্রীয় নির্যাণ তখনও শেষ হয় নাই কি বিপুল আতঙ্ক ও উত্তেজনার মাঝখানে খেয়া-টাঁয়ারের যাত্রী হিসাবে সেদিন যে আবার পদ্মাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা মাত্র অনুভবসাধ্য। এই নদী, চটভূমি ও বালুবেলাগুলি আমার আত্মজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।'...

নদীর মতো তাঁর জীবনটাও ছিল অধিকমাত্রায় তরঙ্গসঙ্কুল এবং কখনো বা শান্ত। তা চিরদিনের মতো স্তিমিত হয়ে গেল ২৮শে মাঘ, ১৩৬৮ (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২) : বর্ধমানের বেতাইবন গ্রামে ১৩০৭ সালের ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট, ১৯০০) সজনীকান্তের জন্ম। পিতা হরেন্দ্রলাল দাস, মাতা তুঙ্গলতা দেবী। ১৩০০ সালের ৪ঠা আষাঢ় পশুপতিনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধারাণীর সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। বালক বয়স থেকে কবিতা রচনার প্রতি আগ্রহী হলেও মূলতঃ তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁর সন্তানদের মধ্যে অন্যতম পুত্র রঞ্জনকুমার। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এসমো ঃ স্বৈরতন্ত্রের লাঠি কাঁধে পুঁজিবাদের প্রহরী

বৈদ্যনাথ সাহা

১৯৮১ সালের ২৭শে জুলাই অত্যাবশ্যক সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ এবং হওনীয় ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি অত্যাবশ্যক পিয় রক্ষা অর্ডিন্যান্স-৮১ (এসমো) জারি করার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক শ্রেণীর মৌলিক অধিকার ও সংগ্রামের হাতিয়ার হরণ করার চালাও ক্ষমতা এসে গেছে। এই অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিণত করার জন্য সংসদের বাদল অধিবেশনে যে বিল আনা হবে সরকারের মূল লক্ষ্য চরিতার্থ করতে তাতে কিছু হেরফের করা হবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে একটি প্রেস নোট জারি করে বলা হয়েছে। তে-অক, লক-আউটও এই অর্ডিন্যান্সের আওতার মধ্যে পড়বে। এই অর্ডিন্যান্সে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাবশ্যক সংস্থার মধ্যে পড়বে রেল, ডাক ও তার, টেলিফোন, বন্দর, বিমানবন্দর, বিমান ঘাঁটি, ব্যাংক, তৈলক্ষেত্র, তৈল শোধনাগার, পেট্রোল ও পেট্রোল জাত দ্রব্যের যোগান ও সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম, হাসপাতাল ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সরবরাহ, সংসদীয় কিম্বা বিধানসভার নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম। রাষ্ট্রপতি এই অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শ্রমিকদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা এবং সংসদে এই অর্ডিন্যান্স আইনে পরিণত করার সুযোগ তুলে দিয়েছেন। শিল্পক্ষেত্রে অশান্তি, বেআইনি ধর্মঘট, উচ্চহারে মজুরী-বেতন-মহার্ঘভাতার দাবি,—এসব দূর করে যাতে মেলে জনস্বার্থ ও নিরাপত্তা বজায় থাকে, শান্তি আসে, উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যায় এবং সমস্ত মানুষের কাছে সহজে ও সস্তায় ভোগ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্যই নাকি এই অর্ডিন্যান্স। এই অর্ডিন্যান্স শুধু ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের শুরুতর দণ্ডদানের ব্যবস্থাও এতে করে রাখা হয়েছে। এমনকি ধর্মঘটে উস্কানি বা মদত দিলে কিম্বা অনুরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তিমাত্রই এই অর্ডিন্যান্সের দ্বারা দণ্ডনীয়।

এই অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ ছ মাস, প্রয়োজনে আরও ছ মাস বাড়ানো যাবে এবং এটি সংসদে গৃহীত হলে আইন হিসেবে তিনবছর কার্যকর থাকবে। এতে শ্রমবিরোধ সংক্রান্ত কোন আপিল বা আপস করাবার ব্যবস্থা নেই। শিল্পবিরোধ ও শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ধামা-চাপা দিয়ে এই অর্ডিন্যান্স মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জনতা আমলেও এই রকমভাবে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চাপা পড়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসমোর প্রয়োজন হল কেন? বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা যে বাজারে চারটি বৃহৎ সরকারী সংস্থায় ৭১ দিন যাবত ১,২৫,০০০ হাজার শ্রমিকের লাগাতার ধর্মঘটের ফলে ১৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে এই সব সংস্থায় (তার মধ্যে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালসের সমান বেতনের দাবিতে ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, হিন্দুস্থান এরোনটিক্স প্রভৃতি এবং অন্যান্য সংস্থায় মজুরী সংক্রান্ত চুক্তি-আলোচনা) বাড়তি মজুরী ও বোনাসের দাবীকে হরণ করার উদ্দেশ্যে এবং প্রচলিত আইন কানুন দিয়ে সরকার শ্রমিক সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম হওয়ার ফলে এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। কোন কোন মহলের ধারণা যে বর্তমানে এমন কোন অত্যাবশ্যক সরকারী সংস্থায় ধর্মঘটের সম্ভাবনা নেই যাতে এই অর্ডিন্যান্স জারী করার যৌক্তিকতা আছে। বরং এই অর্ডিন্যান্স দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসনিক পরিকল্পনারই সূচনা। শ্রমিক বিরোধী এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে ও অধিকারভোগী ব্যক্তিদের হওয়ানের ব্যবস্থা চালু করেই ক্ষান্ত হয়নি, আইনগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত প্রশাসনীতির ওপর চরম আঘাত হেনেছে।

দুই

ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক মানুষের যেমন ধর্ম বা যেকোন বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতা স্বীকৃত, তেমনি বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমিতি বা সংঘ গঠনের

স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার স্বাধীনতা স্বীকৃত। আবার এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃংখলার স্বার্থ ইত্যাদির অজুহাতে খর্ব করা হয়েছে। সংবিধানে ১৯নং অনুচ্ছেদে সমস্ত স্বাধীনতার যে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে ও তার বিভিন্ন অংশে যেসব মৌলিক অধিকার স্বীকৃত, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ বসানোর অবাধ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এই বাধানিষেধ যুক্তিসংগত কিনা তার বিচারের ক্ষমতা আদালতের আছে। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার-রক্ষার আদালতের প্রতিকারের ব্যবস্থাকেও অকার্যকর করা যায়। রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারকেও অকার্যকর ঘোষণা করতে পারেন। ফলে এসবো ঘোষণা করার শ্রমিকশ্রেণীর শুধুমাত্র ধর্মঘট করার অধিকারই হরণ করা হয়নি, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পাবার ন্যূনতম অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুতরাং এসবো একপ্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে ২২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র আইন করে যে-কোন নাগরিককে দীর্ঘকাল বিনাবিচারে আটক রাখতে পারবে। বিনা বিচারে আটক রাখার নীতিকে অর্থনৈতিক অপরাধী বা সমাজবিরোধীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা চাবচোল পিটিয়ে জানিয়ে অবশেষে রাজনৈতিক কারণে বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৫২ নং ধারায় ও ৩৫৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা সমস্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে। ৩৫৯ নং ধারা অনুযায়ী বিধানসভাগুলি ভেঙে দিয়ে যে-কোন রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করতে পারেন। অথচ ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এবং মানুষের রক্ষাকবচ বলে গণ্য যে সব গণতান্ত্রিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যা অন্যতম লক্ষণ তাকে খর্ব করার অধিকারও সংবিধানে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে। সুতরাং ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী, শোষণ ও মুনাফা অর্জনের পথে বাধাস্বরূপ শোষিত শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার, ধর্মঘট বা যে-কোন আন্দোলনের হাতিয়ার খর্ব করে শোষিত বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণীকে শান্তিদানের ব্যবস্থাও সংবিধানে রাখা হয়েছে। সুতরাং এসবো এসেছে এই পথ ধরে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার অধিকার হরণ করতে।

তিন

১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থা কিংবা ১৯৮১-র এসমো—এ সবই হল সংকটগ্রস্ত স্বৈরাচারের পথে এগোনোর প্রস্তুতি।

পুরুলিয়া ফস্

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের অনুমোদিত ফসফেট সার

উনো জমি—দুনো ফসল
অম্ল জমিতে—আরো বেশি।
ব্যবহার করুন
পুরুলিয়া ফস্।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল
ডেভলাপমেন্ট এণ্ড ট্রেডিং
কর্পোরেশন লিমিটেড
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা

প্রথম স্তরে একনায়কতন্ত্রের উপর গণতন্ত্রের আবরণ থাকে। যার আড়ালে শোষক ধনিক-শ্রেণী জনগণকে বিভ্রান্ত করার পালতন্ত্রা খুলি আওড়ায়। কিন্তু ধনবাদের সংকট যখন আরও তীব্রতর হতে থাকে, শোষিত-বঞ্চিত মেহনতী মানুষের মৃদু গুঞ্জরণ যখন সংগ্রামের পথ ধরে ধনবাদী স্বার্থের অবসানের দিকে এগোয়, তখন ধনিক শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠী গণ-তন্ত্রের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে নগ্ন ফ্যাসিবাদের রূপ নেয়। সংকটগ্রস্ত ধনবাদ আত্মরক্ষার তাগিদে দুটি পথ গ্রহণ করে। একটির নাম সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি বা গণতান্ত্রিক সমাজ-বাদ আর অপরটির নাম হল ফ্যাসিবাদ। ধনতন্ত্রের এই সংকটের কথা চিন্তা করে লেনিন বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল মূলধনী পুঁজিবাদের পরিচালনীন একনায়কতন্ত্র; আর ফ্যাসিবাদ হল মূলধনী পুঁজিবাদের নগ্ন একনায়কতন্ত্র। পুঁজিবাদের উন্নততর পর্যায়ে ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির একত্রে মিলিত হয়ে যাবার স্তরকে অর্থনীতির পরিভাষায় Finance Capital বা মূলধনী পুঁজি বলে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতে বা তৃতীয় ভুবনের দেশে তা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নত ধনবাদী দেশের মূলধনী পুঁজিই হোক কিংবা অনুন্নত দেশের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদই হোক, একথা সকলেরই জানা আছে পুঁজিবাদের মৌল চরিত্রের কোন হেরফের ঘটে না। শোষণভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এই ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদের সংকট এড়ানোর স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা ও আপাত বামঘেঁষা নানা-রকম আপ্তবাক্য আওড়ায়। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে, শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথে নেমে আসে, এবং তখন বুর্জোয়া গণতন্ত্র পুঁজিবাদ রক্ষার স্বার্থে গণতন্ত্রের আবরণ উন্মোচন করে স্বৈরতন্ত্র বা নগ্ন ফ্যাসিবাদের রূপ নেয়। গণতন্ত্র তখন ধনিক শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার দীর্ঘকাল থেকেই বিশেষতঃ ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থার সময় থেকে এর প্রকট রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের দিনগুলিতে কিভাবে শাসক ধনিক শ্রেণী স্বৈরতন্ত্র ও নগ্ন ফ্যাসিবাদের দিকে দিকে এগিয়েছে তা সকলেরই জানা আছে। এ প্রসঙ্গে 'দর্পণ'-এর ৩১শে জুলাই ১৯৮১ র সংখ্যায় কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনার জের না টেনে পরবর্তী কালের ঘটনার দিকে তাকালেই ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র কি এবং শাসক শ্রেণী হিসেবে বিশেষ কোন শ্রেণী ক্ষমতার আসনে ঘুরে ফিরে আসছে তা কিছুটা বোঝা যাবে।

চার

১৯৭৭ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগে প্রকাশিত হয় ও নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ইন্দিরাজী পদত্যাগ না করায় গণআন্দোলন প্রকট হয়ে ওঠে। সেই সময় পুরোনো জরুরী অবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে অবাধ্যকতার অজুহাতে ইন্দিরাজী আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, জনগণের সর্ববিধ রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ধনিক শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা তখন স্বৈরতন্ত্র, নগ্ন একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসি-বাদের দিকে এগোয়। পুঁজিবাদের এই সংকটকে ঠেকে রাখার জন্য বিশদভাবে তালিকা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। তবুও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচন হয়। ভারতের ধনিকশ্রেণী তখন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী ছিল। নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতে গণতন্ত্র ফিরে না এলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না জেনেই ধনিক শ্রেণী নির্বাচনের চাপ দিয়েছিল। তাছাড়া জরুরী অবস্থার সময় ৪২তম সংশোধনের ভেতর দিয়ে যেভাবে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, নির্বাচনে জয়লাভ ঘটলে তাতে গণসমর্থন পাওয়া যাবে, ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা হবে এবং নগ্ন একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বা-চনে ইন্দিরাজীর চরম পরাজয় ঘটে এবং শাসক ধনিক শ্রেণীর ভিন্ন গোষ্ঠী 'জনতা দল' কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় আসে। জনতা দলের নেতৃবৃন্দ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে চলার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তারা পালন করতে পারেননি। বরং সংকটগ্রস্ত ধনবাদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তারা সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ফলে অর্থনৈতিক সংকটের সমস্ত বোঝা এসে চাপল মেহনতি জনগণের মাথায়। শুরু হয়ে গেল ব্রাকার, লক-আউট, শ্রমিক ছাঁটাই। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দাবী পূরণ না করে বরং গণতন্ত্র বিরোধী পুলিশী অত্যাচার ও জুলুম চলতে লাগল। কানপুর, শঙ্করনগর ও বাইলাডিলায় কৃষক শ্রমিক হত্যা করা হল। মিসা-ডিফা চালু করে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা করা হল। তাছাড়া লোকসভায় একটি নতুন বিল পেশ করা হয়, যার নাম শিল্প সম্পর্ক বিল বা Industrial Relations Bill, যার

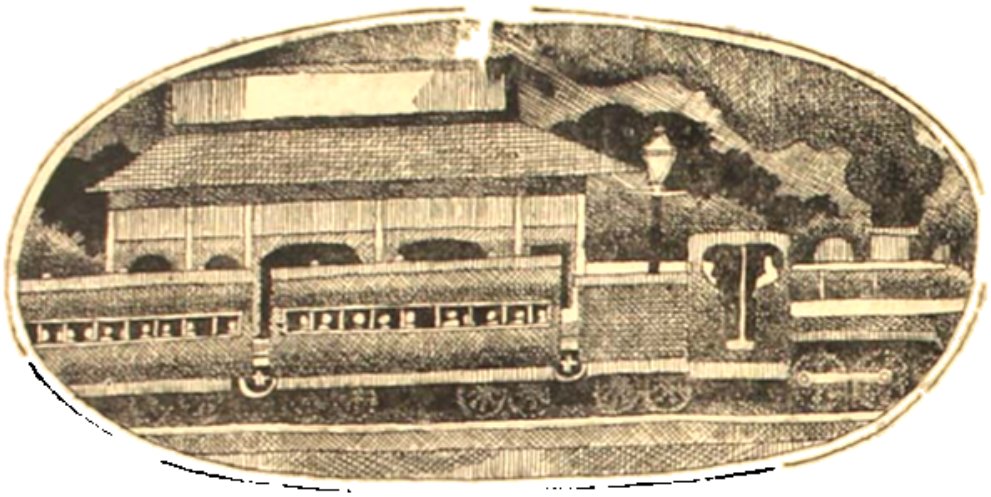

"ভবানীপুরের তেতলা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায় —
এবার এবু পাহাড়ে না সাদুরা,
না ডালহৌসি কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ ?।"

যেখানেই যান না কেন,
আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের বর্ধমান ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংকট ঘনিয়ে আসে, অর্থনীতি ধস ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং চরণ সিংয়ের নেতৃত্বে 'তদারকি' সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের স্বল্পকালীন মেয়াদেও কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। সুতরাং ধনিকশ্রেণীর যে পোষ্টই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, পুঁজিবাদী সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। বরং জনগণের ঘাড়ে অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা চাপিয়ে তারা গণতন্ত্র হত্যার পথেই এগোবে। তার প্রমাণ হচ্ছে জনতা সরকারের আমলে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী চরণ সিং যে বাজেট পেশ করেছিলেন তাতে বিদেশী ঋণের উপর আরো বেশী নির্ভর করার কথা ছিল, পরোক্ষ করের বোঝা আরও বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতেও যে পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি তা তাদের শ্রেণীচরিত্রেই প্রমাণিত হয়ে গেছে।

১৯৮০ সালের এই জানুয়ারী মাসের লোকসভার নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় ফিরে এলেন। নির্বাচনের পূর্বে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,—যেমন, বৈরতন্ত্রের পথ বর্জন, পরোক্ষ কর ধার্যের নীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি বা ঘাটতি কাগজীনোট ছাপানোর নীতির পরিবর্তন, সারাদেশে একই মূল্যনীতি স্থির করে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আনা ও সরকারী বন্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন—এই রকম গালভরা যে সব প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তা পালন করা তো দূরের কথা, বরং তিনি পুনরায় সেই একই পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। ফলে মাত্র কয়েক বছরের শাসনকালেই দ্রব্যমূল্য প্রচণ্ড বেড়ে গেছে, সাধারণ মানুষের কাঁধে পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে ঘাটতি বাজেট পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার নামে বিদা বিচারে আটক রাখার অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে, শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট বিরোধী আইন এবং সর্বশেষে এসমো (Essential Services Maintenance Ordinance) ঘোষণা করে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় বৈরতন্ত্রের পথেই এগোচ্ছেন। তিনি বলেছিলেন যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা তাঁর ভুল হয়েছে এবং তিনি সে পথে আর যাবেন না। কিন্তু তিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে পুনরায় বৈরতন্ত্রের পথ ধরে সংকটগ্রস্ত পুঁজিব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রের টুঁটি টিপতে শুরু করেছেন এবং ফ্যাসিবাদের দিকেই এগোচ্ছেন। সুতরাং এসমো কোন নতুন ঘটনা নয়, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের পাহারাদার হিসেবেই শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচ

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই অবস্থা সৃষ্টি হল কেন? ধনতন্ত্রের গতিপথ একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। ধনবাদী সমাজে সমস্ত অর্থসম্পদ এসে জমা হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। অপর দিকে থাকে কোটি কোটি সর্বহারা, যারা প্রতিনিয়ত চরম দৈন্য দুর্দশার উপনীত হয়। ধনতন্ত্রের এই নিয়মই হল Polarisation of Capital বা ধনসম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার স্তর। এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট আসে, ধনবাদী প্রথায় উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে আসে, উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, পুঁজি লগ্নীর সুযোগ থাকে না, উৎপন্ন দ্রব্যের নতুন বাজার সৃষ্টির পথও রুদ্ধ হয়ে আসে। এভাবেই ধনতন্ত্র তার প্রবর্ধমান গতিপথের দিকে এগোতে গিয়ে সংকটের আবর্তে পড়ে।

এখন একটু খতিয়ে দেখা দরকার যে ভারতের শাসক ধনিকশ্রেণী কোন অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে এবার চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে এসেছে, যার সমস্ত বোঝা জনগণের উপর চাপিয়েও নিষ্পিষ্ট করা যাচ্ছে না।

ছয়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই ভারতের ধনিকশ্রেণীর শাসক সম্প্রদায় জাতীয় অর্থনীতিকে প্রধানতঃ তিনটি মূলনীতির উপর খাড়া রেখেছে, যার ধারাবাহিক গতি আজও অব্যাহত। [পূর্বাপর তথ্য ও বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য "আমির ধনক : বিত্তবের দর্শক" / মাখন পাল (শারদীয় গণবার্তা, ১৩৮৭) দ্রষ্টব্য] প্রথমতঃ বিদেশী মূলধনের আমদানি বা বিদেশী ঋণ সংগ্রহ। দ্বিতীয়তঃ পরোক্ষ কর ধার্য ও তৃতীয়তঃ মুদ্রাস্ফীতি।

বিদেশী ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এখন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যা ভাবলে বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটে। ১৯৮০ সালেই দাঁড়িয়েছে ১৫,৯৭৮ কোটি টাকা। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (I.M.F.) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার ঋণ ভারত পেতে পারে বলে খবরে জানা গেছে। এত বিপুল পরিমাণ ঋণ ইতিপূর্বে কখনও গ্রহণ করা হয়নি। এই টাকা পরিশোধ করার মত অবস্থা ভারতের নেই। এতকাল পর্যন্ত বিদেশী ঋণের উপর নির্ভর করেও জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলা যায় নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও গড়ে তোলা যাবে না। কারণ এই ঋণ প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় তা দিয়ে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয় না। এমন কি সরকার

বিভিন্ন বৃহৎ অন্ধকারাচ্ছন্নতাগুলিতেও উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বেড়েছে। ছোট ও মাঝারি শিল্পে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর্থিক সাহায্যের বেশীর ভাগই একচেটিয়া ধনিকশ্রেণীর বিভিন্ন শিল্প-কারবারে বিনিয়োগ করা হয়।

কৃষিভিত্তিক শিল্প-উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। প্রায়ক্ষেত্রে ধনবাদী অর্থনীতি চালু করে ধনী জোতদারদের সাধারণভাবে সাহায্য করা হয়েছে এবং গরীব ও মাঝারি কৃষকদের জমিজমা পুঁজিপতি জোতদারদের কবলে চলে গেছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে ধনী জোতদার শ্রেণী আর্থিক সাহায্য পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, আর অন্যদিকে অগণিত ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর বৈষম্য দূরীকরণের প্রত্যক্ষ সীমায় পৌঁছে দিনের পর দিন ধুঁকছে।

দ্বিতীয়তঃ দেশের শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। দেশের একচেটিয়া ধনি-বণিক ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর উপর প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বেশী পরিমাণে ধার্য করা উচিত ছিল এবং সেইসঙ্গে দেশের দরিদ্র জনগণের ওপর চাপানো পরোক্ষ করের পরিমাণ কম করে ধার্য করাই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসল ঘটনা ঠিক এর উল্টো ধারাতেই এতকাল প্রবাহিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ কম বলেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে দেশের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করলেই সমস্যার গভীরমূল কোথায় তা ধরা যাবে।

১৯৫৩-৫৪ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কালডর ভারতের আয়কর ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বলেছিলেন, ভারতের শিল্পপতি গোষ্ঠী প্রতিবছরে কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেয়, যার পরিমাণ উপরোক্ত বছরেই ছিল ২০০-৩০০ কোটি টাকা। সরকার নিযুক্ত কমিটি কমিশন,—যেমন, ১৯৪৮ সালে এন, ঘরদাচারির নেতৃত্বে, ১৯৫৪ সালে জন মাথাই-এর নেতৃত্বে, এবংকি ১৯৬৬ সালে আয়ার-এর নেতৃত্বে যেসব আয়কর অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়, তারা সকলেই প্রত্যক্ষ আয়কর ফাঁকি সম্পর্কে একমত হয়েছেন। ১৯৫৮ সালে মহাবীর ত্যাগীর নেতৃত্বে, ১৯৭০ সালে কে, এন, ওয়াংচু-র নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। এই সব কমিটি ভারতের শিল্পপতি গোষ্ঠী যে প্রত্যেক বছরে কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেয় তা নিঃসন্দেহে জোর দিয়ে বলেছেন। এই আয়কর ফাঁকি দেওয়া টাকাই কালো টাকা। এছাড়া গোপন আয়, লুকনো ধনসম্পদ ও চোরাকারবারে নিযুক্ত টাকা এসবই কালো টাকার আওতায় পড়ে। জাতীয় অর্থনীতির পাশাপাশি এই কালো টাকার চলাচল ভারতের অর্থনীতিকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ওয়াংচু কমিটি এই কালো টাকার জন্য সরকারের অর্থনীতি ও পাঁচসালা পরিকল্পনাকে দায়ী করেছেন। ওয়াংচু কমিটি

ব্যাঙ্ক চিত্রিত/চাঙ্গা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বজায় • পরিবার সরকার

যেসব সুপারিশ করেছেন সরকার তা গ্রহণ করেন নি। কারণ কালো টাকার মালিকদের সঙ্গে পাসকরদের সোসাল শ্রেণীস্বার্থ জড়িত আছে।

প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে প্রত্যেক বছরে পরোক্ষ করের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে এই পরোক্ষ করের পরিমাণ ছিল সাতশো কোটি টাকা। তবুও বাজেটে ঘাটতি ছিল দু'শো কোটি টাকা। অথচ ধনিকদের উপর ধার্য প্রত্যক্ষ কর দু'শো কোটি টাকা আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে পরোক্ষ করের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে ১৩,৯১৪ কোটি টাকা এবং প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ধার্য ছিল মাত্র ২,৭৮২ কোটি টাকা।

এখন আমাদের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হবে না যে কেন দিন দিন নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে. কেন বেহদ্দী শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মানুষের অভাব, দুঃখ বৈন্য বাড়ছে, সর্বনাশ ঘনীভূত হচ্ছে এবং অপরদিকে কিভাবে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে দিন দিন ধনসম্পদ সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে পাহাড়ের মত জমে উঠছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর পরোক্ষ করের বোঝা চাপানোর ফলে কিভাবে দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলেছে তার একটি অতি সাম্প্রতিক হিসাব নিচে উল্লেখ করা হল। ১৯৮০ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে ধরা হলে দেখা যায় জিনিসের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ এবং ১৯৭০-৭১কে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ধরে দ্রব্যমূল্য কিভাবে প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে তার একটা হিসাব দেওয়া হল :—

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস (ই) সরকার আসার পর থেকে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি বেশকে গ্রাস করেছে। ১৯৮০ সালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও সরকারী হিসেবে পাইকারী দর (মূল্যসূচক ১৯৭০-৭১=১০০) ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বেড়েছে ২৮৪'৬, আগের সপ্তাহে ছিল ২৭৯'৫। ফলে মূল্যসূচক বেড়েছে পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় ১'৮% একবছরে মূল্যসূচক বেড়েছে ২৫৭'২ (১২ই জুলাই, ১৯৮০) থেকে ২৮৪'৬ (জুলাই ১১, ১৯৮১) এছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য ও পেট্রোলিয়ামের দাম বেড়েছে হু হু করে। ১৯৮০-৮১ সালে ফসল উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও কৃষিজাত পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ অর্থনীতিকে সংকটাপন্ন করে তুলছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

১৬ই মে ১৯৮১ থেকে ১১ই জুলাই ১৯৮১ মাত্র এই দুই মাসে পাইকারী মূল্যসূচক বেড়েছে ২৭৭'৩ থেকে ২৮৪'৬। তাছাড়া কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের দাম এই সময়ের মধ্যে কিভাবে বেড়েছে তার হিসেব দেওয়া হল : খাদ্যদ্রব্য : ২২৪'৫ থেকে ২৩৯'১, অন্যান্য দ্রব্য : ২৩২'৬ থেকে ২৪২'১। খাদ্যশস্য (ধান, গম) বেড়েছে : ২০৭'২ থেকে ২১৬'১ এবং ডাল ৩৩৯'১ থেকে ৩৫৬'৫। ১৯৮০-৮১ সালে উপযুক্ত বৃষ্টিপাত ও ফসল উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও চাল, গম, ভোজ্য তেল ও ডালের দাম হু হু করে বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাচ্ছে না। সরকার সিমেন্টের দাম বাড়িয়েছেন দু'দিন আগে। খাদ্যশস্য ছাড়া ইস্পাত, কয়লা, নন-ফেরাস্ ধাতু ও বিদ্যুতের দাম বাড়বে। ফলে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আরও বেড়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। (স্টেটসম্যান, ২৮শে জুলাই, ১৯৮১ থেকে গৃহীত)

এরপর তৃতীয় স্তরে আসছে মুদ্রাস্ফীতি বা বেপরোয়া কাগজী নোট ছাপানোর নীতি। প্রয়োজনীয় মূল্য বজায় না রেখে খুশীমত কাগজী নোট ছাপিয়ে মূলধন সংগ্রহ করতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কী পরিমাণে বেড়েছে বিদেশের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিদেশী ঋণ ও পরোক্ষ কর থেকে যখন মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তখন এই নীতি গ্রহণের ফলে প্রথম দিক বছরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ১,১৬৪ কোটি টাকা। ১৯৭৭ সালে এই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৩,০৩৪ কোটি টাকায়, ১৯৮০ সালে ৩,৩২৯ কোটি টাকার কাগজী নোট ছাপানো হয়। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে কোনস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং কেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তা অনুধাবন করা সহজ হবে।

এই সঙ্গে ১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক যোজনার যে খসড়া যোজনা কমিশনে পেশ করা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নীচে উল্লেখ করা হল। এর থেকে ১৯৮১-৮২ সালের তথা সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারনা করা যাবে :—

১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক যোজনার দুটি স্পষ্ট সংকেত রয়েছে। (১) জিনিসপত্রের দাম বাড়তেই থাকবে (২) বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে আরও ঘাটতি দেখা দেবে। আর এই ঘাটতি মেটাতে হবে বৈদেশিক সাহায্য ও অন্যান্য উপায়ে। মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে যোজনা খসড়ায় বলা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই চাপগুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলিলে বলা হয়েছে।

বাণিজ্যিক লেনদেনে ঘাটতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, পুরোপুরি উৎপাদন ভিত্তিক ব্যাপারগুলিতে জোর দিতে হবে।...

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক কাঠামোগত সুবিধার উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে অত্যাবশ্যক

পণ্য আমদানির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।... মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী সংস্থা সম্পর্কিত প্রকল্পে অর্থ সংস্থান কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বাজেটের আর্থিক সংস্থান এবং সরকারী সংস্থাগুলির নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রে ১৯৮১-৮২ সালের ঘাটতি রাখা হয়েছে ১৪৩১ কোটি টাকা। মোট ছাপিয়ে ঘাটতি মেটানোর পরিমাণ বাজেটে দেখানো হিসাব মত রাখার জন্য চেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে মোট ছাপিয়ে ঘাটতি মেটানোর পরিমাণ বাজেটে দেখানোর হিসেবের চেয়ে বেড়ে যাবে। ৮১-৮২ সালের বার্ষিক যোজনার সরকারী ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৭,৪১৭ কোটি টাকা। ৮০-৮১ সালে ছিল ১৪,০১১ কোটি টাকা। মানে বেড়েছে ১০·৩% শতাংশ। আশা করা যাচ্ছে ৮১-৮২ সালের বাড়তি আর্থিক সম্পদের বেশী টাকা আসবে বাজার থেকে পাওয়া বেশী ঋণ, পর সরকার থেকে পাওয়া টাকা ও বিবিধ মূলধনী খাতের বৃদ্ধি থেকে। (আনন্দবাজার, ৭ই আগষ্ট ১৯৮১ থেকে গৃহীত)

অর্থনীতি একদিকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের চরম দুঃখ দুর্দশা ডেকে এনেছে, অপরদিকে একচেটিয়া বণিক-বণিক-শিল্পপতি গোষ্ঠীর সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে বৃদ্ধিটি শিল্পপতি গোষ্ঠীর মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৩,০৭১৯৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫,৪০১৭০ কোটি টাকা। তার মধ্যে বিড়লা ও টাটা গোষ্ঠির মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮১% ভাগ ও ৬৬% ভাগ। এছাড়া মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে এই বৃদ্ধিটি গোষ্ঠির ঐ পাঁচ বছরে যখন পরিমাণে। ১৯৭২-৭৩ সালে মুনাফার পরিমাণ ছিল ৬৮০ কোটি টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি টাকায়। এর সঙ্গে বিদেশী ধনপতি গোষ্ঠি, বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানী ও মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশনের ভারতীয় শাখা এ দেশ থেকে বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে কে-হারে দেশী-বিদেশী শিল্পপতি গোষ্ঠির মুনাফা বাড়ছে, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী-বেতন-বোনাস কমে যাচ্ছে বা পা ও য়া তে বেতন-মজুরী বাড়লেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রকৃত আয় দিনের পর দিন অস্বাভাবিক ভাবে কমে যাচ্ছে। কারণ মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরী, বেতন বা মহার্ঘভাতা বাড়ানো হয় না। শিল্প-কলকারখানায় বোনাসকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘাঁতি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায়

অপচয় বন্ধ করুন...

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-মালা
ওরে মিছে মঙ্গল কলস"

সঞ্চয় সকলের
কল্যাণে
নিয়োজিত করে
সার্থক হোক
আমাদের
শারদোৎসব

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার রেখে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার। এই সুযোগে অটোমেশন ও কমপিউটারের দাপট মুক্ত হয়ে পুরনো কর্মীদের চাকরি যাবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। এইসব শোষণ, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার মত ন্যায্য বেতন ও মজুরীর দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট ও আন্দোলন করার যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল ১৯৮১ সালের ২৭শে জুলাই এসে তাও বন্ধ করে দিল। অর্থাৎ এতকাল ধরে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনের শোষণ করা হচ্ছিল এবং ধনপতি-শিল্পপতি গোষ্ঠির মুনাফার পাহাড় জমা হচ্ছিল, তাকে আরও কতটা বাড়ান যেতে পারে তারই সুপরিকল্পিত ছক হল এই অর্ডিনান্স, যা বিল-হিসেবে পার্লামেন্টের বাদল অধিবেশনে আনা হবে এবং গৃহীত হলে আইন হিসেবে তার মেয়াদ তিন বছর থাকবে। এই রচনা ছাপা হতে হতে বর্তমান অবস্থা হয়ত আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে, হয়ত অর্ডিন্যান্স লোকসভায় আইন হিসেবে পরিণত হবে, অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের বাজার হয় আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। তবু হাতের সামনে এ-পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে তাকে ভিত্তি করেই এ লেখা শেষ করতে হচ্ছে।

সাত

এখন আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে যে ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থনীতি এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেভাবে ধনিক তোষণনীতির উপর খাড়া রয়েছে, তার উপরে এসবের মত কয়েক শত অর্ডিনান্স চাপিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টার কথা প্রচার কতটুকু সত্যভাষণ? এসবের সম্পর্কে আরও বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে এই জাতীয় অর্ডিন্যান্স দেশে কি প্রকৃতপক্ষে শান্তিশৃঙ্খলা, মেহনতী মানুষের স্বার্থ ও জননিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য চাপানো হয়েছে? এই অর্ডিন্যান্স কি সত্যিই মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করবে? এ বিষয়ে সম্পর্কে সরকারের তরফে যেসব কথা বলা হয়েছে—তা যে বিন্দুমাত্র সত্যভাষণ নয়, বরং ভারতের প্রমজীবী জনতাকে শোষণের বিনিময়ে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, মুনাফা বৃদ্ধি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মূলধনকে আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজনেই নিযুক্ত করা হয়েছে উপরোক্ত তথ্য থেকে তা উপলব্ধি করতে কারও অসুবিধা হবে না। কারণ ভারতবর্ষে ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে, ব্যাঙ্ক ও সরকারী লেনদেন সংস্থার আর্থিক লাভালাভ আসলে তাদেরই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিনিয়োগ করা হয়, উপরন্তু বাজেট পুরণের জন্য পরোক্ষ কর ও মুদ্রা-স্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, সেক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থরক্ষার জন্য যত বড় গালভরা বুলি আওড়ানো যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা বা ফাঁকি দেওয়ার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যায় না। বাস্তব যোজনার দলিল, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে সেসব তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে। তাহলে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কেন এই প্রতারণা? কেন এই মিথ্যাভাষণ?

আট

ভারতবর্ষে ধনবাদী সংকট চরম স্তরে পৌঁছে গেছে, স্বাধীনতার পরবর্তীকাল বিশেষতঃ প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার আমল থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে ধনবাদী বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক রাজ-নীতিকে এখন আর বেশীদিন গণতান্ত্রিক রাখা সম্ভব নয়, মিথ্যাভাষণ ও প্রতারণা দিয়ে যতদিন চালানো যায় তার প্রচেষ্টা তাকে করতেই হবে, নচেৎ শেষপর্যন্ত আর একটি পথই খোলা থাকে - তা হল গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে ফেলে ফৈরতন্ত্রের পথের দিকে এগিয়ে চলা। এটাই হল প্রতারণা বা মিথ্যাভাষণের মূল কারণ এবং নগ্ন একনায়কত্ব বা ফ্যাসি-বাদের পথই হল তার সর্বশেষ পরিণতি। সংকটগ্রস্ত ধনবাদ ও শাসক ধনিকশ্রেণীর পক্ষে বাঁচার মত এই একটি পথই খোলা আছে—তা হল নগ্ন ফ্যাসিবাদের পথ। এসবের প্রমাণ সেই পথ ধরে, ফৈরতন্ত্রের লাঠি বাগে নিতে পুঁজিবাদের পাহারাদার হিসেবে। কিন্তু এই মুমূর্ষু ধনবাদ বেশীদিন এভাবে টিকে থাকতে পারে না, একদিন তাকে বিদায় নিতেই হবে।

তাই শ্রমজীবী জনতার সামনে এসেছে সময় ততক্ষণ। এই শুভক্ষণে, ধনবাদী সংকটের পরিস্থিতিতে, সমাজ-সংস্কারের শক্তি-গুলির শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামী শক্তিকে, বিপ্লবী শ্রেণীচেতনাকে জাগ্রত রেখে মানুষ ঐতিহাসিক বিচারবোধ নিয়ে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের দূরন্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ভারতবর্ষের আশাময় জনগণকে শ্রমিক-কৃষক শক্তির দুর্গত মানুষের সঙ্গে বিশাল জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে এগিয়ে যেতে হবে, ফৈরতন্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত সংগ্রামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়া ভারতবর্ষের দুর্গত শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। এই পথেই আজ ভারতের মুক্তি। সেই মুক্তির পথ সংগ্রামের পথ, বিপ্লবের পথ। এই পথ ধরে এগোতে না পারলে ফৈরতন্ত্রের হাত থেকে, অন্যান্য শক্তির কবল থেকে কিম্বা সেই ইনকার্নো বা দাওব দাহন থেকে ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের মুক্তি নেই।

নারীমুক্তি ঃ সাহিত্যে চিন্তায় ও চেতনায়

রশীদ আল ফারুকী

পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য বলে কথিত 'রামায়ণে'র শেষের পুস্তিটির পরিকল্পনা সত্যি সত্যি বৈপ্লবিক। রামরাজ্যের প্রজা যখন প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে সীতাকে প্রকাশ্যে তাঁর সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা প্রদানের আহ্বান জানালেন, তখনি দেবী ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে তাঁর সন্তানকে কোলে তুলে নিতে পারতেন। তাতে সন্তানের একটা সুরাহা হতো বটে, কিন্তু মানবধারা থাকতো না। কারণ লোক পরম্পরায় দেবীর সতীত্ব সম্পর্কে যে গুঞ্জন উঠেছে তার ভিত্তি যাই থাক না কেন, মুখ লোকের মুখ চাপা দেবার শক্তি তো দেবীর নেই। সেকারণেই সীতা এই কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে সাহসী হন। অবশ্য তাঁর দৈহিক শুচিতা এবং আত্মিক শক্তিই যে এই পরীক্ষাকল্পে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তাতে দ্বিতর্কের অবকাশ নেই। শেষে দেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভেতরে অভিমানী নারী দ্বিধাবে তাঁর অস্তিত্বকে শুধু বিপন্ন করে তুললো। তাঁর ভেতর কী প্রশ্ন সেদিন উঁকি দিয়েছিলো? প্রশ্ন যাই হোক না কেন, এর সহজ সমাধান সেদিনের লেখক বা পাঠকদের কল্পনায় আসে করা সত্যি অদ্ভুত-পূর্ব। আসলে এই পরিণতিকে কেন্দ্র করে কবি বা কবিরুক্ত মূলতঃ নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিকেই সোচ্চার করে তুলে ছিলেন। না, পরীক্ষা দিতেই হবে। কারণ নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটি তারই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তাই বলে নারীত্বের অবমাননা?

মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। কোন স্ত্রীর পক্ষেই পাঁচজন স্বামী গ্রহণ করা সম্ভব নয় সমীচীনও নয়। তবু অবস্থার চাপে দ্রৌপদীকে তাও স্বীকার করে নিতে হয়েছে। যাজ্ঞসেনীর প্রসঙ্গটি আমি তুলবো না। কারণ সেটি সে যুগের একটি বিশিষ্ট ধারা। উপরন্তু স্বয়ংবরা হওয়ার নিয়মে নারীর অধিকারের স্বাধিকটা আস্বাদ রয়েছে। এটিও এক ধরণের স্বাধীনতা বৈকি। অবশ্য পঞ্চ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা হওয়ার পেছনে পাণ্ডব-ভ্রাতার যে ভূমিকা তাকেও কেউ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। করা খুব স্বাভাবিকও। কারণ, সেই নারীও তো একটা বিশেষ অধিকার বলে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নারীত্বের দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এতদ্বারা নারীর প্রতি পুরুষের অবহেলার যে ভাব ফুটে উঠেছে তাই ভাবুক মহলকে শুঁচিয়ে দিয়েছে। দুর্যোধন দুঃশাসন কর্তৃক অপমানিতা হবার পর দ্রৌপদীর যে আকুলি তাতে নারীর অসহায়তাই বেশি পরিস্ফুট। সীতা সেই অসহায়তা অতিক্রম করে গোটা নারী জাতির চলার পথেই যেন আলোকবর্তিকা হয়ে থাকলেন।

মঙ্গলকাব্যে এসে এই বোধ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মনসামঙ্গল কাব্যে যে রূপকেই হোক না কেন, মূলতঃ নারী ও পুরুষের ভেতর দ্বন্দ্বের চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মনসাদেবীর ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণতার কোন নীতিগত ভিত্তি নেই, যদিও চাঁদ সওদাগরের ভূমিকার পুরোটাই নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, সনকা বা বেহুলা চরিত্রে যে দার্ঢ্য লক্ষ্য করা যায়, তার চেতনামূলে পুরুষের প্রাধান্যই ক্রিয়াশীল—যার এক কোটিতে চাঁদ সওদাগর অন্য কোটিতে লখীন্দর। এর ভেতর চণ্ডীমঙ্গলে মজুমদারে হঠাৎ নারীপ্রশ্ন এসে পড়লো কিভাবে কে জানে। কালকেতু উপাখ্যানে পুরুষের তুলনায় নারীই প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রাধান্য ভিতরে বাইরে বিস্তৃত। কালকেতুর প্রতি ভালোবাসা ফুল্লরাতে অন্যান্য অনটনের ভেতরও সুখে থাকার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছে। এখানে অবশ্য মানসিকতার প্রতিভূ হিসেবে চিত্রিত —যার মনে জন্মদিকন করেছে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা। পারিপূরিক গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ থেকেও যে ব ব ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তার প্রমাণ ফুল্লরা কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে বা স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে ও মোহে স্বামীর ভালো-বাসার অবীকৃতির মেনে নেওয়ার অস্বীকৃতি। দেবীকে নেপথ্যে রেখে কবি কি এই অস্বীকৃতি-কেই মুখ্য করে তুলতে চেয়েছেন? কে জানে? হয়ত বা তাই হবে। কিন্তু ধুল্লনা-লহনা উপা-খ্যানে হঠাৎ একই চিত্র কেন যে পরস্পর-বিরোধী হয়ে পড়লো তাও বোঝা মুশকিল। লহনাকে বিয়ে করার পর ধুল্লনার অনিশ্চিত ভাগ্য সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তা ধনপতির সঙ্গে হরকরাকবিতেই বিধৃত। কিন্তু তাই বলে গহনার বিনিময়ে? যে ভাবেই হোক সতীনের সঙ্গে ঘর করতে স্বীকৃতি প্রদান নারীত্বের প্রতি চরম অবমাননার সামিল। পরেই আবার রামায়ণী কায়দায় সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা এবং তাতে সফল উত্তরণ। একেত্রে বিস্ময়কর হলো, এতকাল অতিক্রমণের পরও কোন প্রকার বিবর্তনের অনুপস্থিতি। রামা-য়ণের সেই অগ্নিপথ কেন আরো স্পষ্টভাবে পাঠককে তার বাহাত্ব উপলব্ধিতে প্ররোচিত করলো না? নারীর এই গতি শেষপর্যন্ত

কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার আনুষ্ঠানিক প্রধান তাহজীব।

এই বিবর্তনে মুসলমান শাসনের কোন প্রভাব ছিলো না একথা বোধহয় নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে তার মাত্রা কতটুকু সেই প্রশ্ন হতে পারে।

ইসলামপূর্ব আরবে নারীর অবস্থা তো এমন ইতিহাসের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিংশশতাব্দীর বন্ধুর পথে পৌঁছেছে। সেদিন আরবে নারী ছিলো ভোগের সামগ্রী। তার সঙ্গে চলতো ছল। নারী ও ছলের নেশায় বুঁদ আরবেরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করতেন। সেই কলহকে চিরজীবী করে রাখার উদ্দেশ্যে লিখতেন কবিতা। অথবা কবিতার মিষ্ট ছন্দের তালই হয়তো আরবের নারীর প্রতি আকৃষ্ট করতো। যে নারীর খেয় নিয়ে পুরুষের অন্তহীন বিলাস বাধ্যতামূলক হয়ে উঠতো, সেই নারীকে কেন আরবের কোন কোন গোত্র অভিশাপ হিসেবে গণ্য করতেন, তার হদিস পণ্ডিত ও গবেষকরা আবিষ্কার করবেন। তবু আমার মনে হয় ইসলামপূর্ব যুগের আরবে নারীর রূপ ও শক্তির এই অপব্যবহার চিন্তাবিদদের ভাবিয়ে তুলে থাকবে।

হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের পর নারীর অবস্থান তুলনামূলকভাবে দৃঢ় হয়েছে। তিনি নারীমুক্তিকে তাঁর মিশনের অঙ্গীভূত করে শুধু যে বাস্তবকেই মেনে নিয়েছেন তা নয়, বরং গোটা আন্দোলনটাকেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। সেদিনের জন্যে এই ভূমিকা ছিলো বৈপ্লবিক। হয়ত বৈপ্লবিক বলেই বাধাটাও এসেছিলো প্রত্যক্ষভাবে। প্রাক-ইসলাম যুগে কাব্যে-সাহিত্যে, ব্যক্তিগত আচার আচরণে নারীর স্থান যাই থাক না কেন, ভোগের সামগ্রী হিসেবে তা ছিলো প্রত্যক্ষ। সেজন্যে হজরত মোহাম্মদকে তিন ভাবে এই বাধার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয়েছে। বেহেস্তে নিত্যযৌবনা নারী ও 'সরাবান তাহুরা' একারণেই বরাদ্দ থাকবে শুধু পুণ্যবানদের জন্যে—যারা পৃথিবীতে তা ত্যাগ করতে পারবেন।

এসব তাবজলতের কথা—তত্ত্বকথাও বলা যায়। সেদিন বাস্তবেও নারীর অবস্থার বিপুল পরিবর্তন এসেছিলো। নারীরা নিজ নিজ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। জ্ঞানচর্চায়ও তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আরবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর ভূরি ভূরি প্রমাণও মিলবে। আরববাসীর খেলাফতের শেষ পর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিলো। কারণ অবরোধ প্রথা সম্পর্কে তখনো সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ধারণা ছিলো স্বচ্ছ। একমাত্র ক্রীতদাসীরাই আপাদমস্তক আবৃত রাখতেন—আজও বোরকা পরিহিতাদের কেউ কেউ তেমনটি রাখেন। এর হয়তো কোন সামাজিক কারণ থেকে থাকবে। হয়তো একই কারণে পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে অবরোধের শক্তাকড়ি আরোপ করা হয়েছিলো—যেমনটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত হিন্দু সমাজেও প্রাদুর্ভূত হয়। আরব ধারণা, হিন্দু মুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই একটা অজ্ঞাত ভীতি কাজ করেছিলো যার বশে নারীর ক্ষেত্রে অবরোধের বাহুল্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পাঠক এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারেন, মোগল আমলে শাহজাদীদের বিয়ে হতো না। তারা জ্ঞানচর্চা করতেন বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান বিতরিত হতো ব্যক্তিগত পর্যায়ে। কোন কোন শাহজাদী রাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণ করতেন নিজেদের নেপথ্যে রেখে—ব্যক্তিক্রম নূরজাহান। নূরজাহানের ক্ষেত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ কতদূর কাজ করেছে তা বলা মুশকিল। এমনও হয়তো হিন্দুদের ভেতরও অবরোধ প্রথা চালু ছিলো। এর পেছনে সম্ভবতঃ কাজ করেছে মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে সুন্দরী রমণীদের দূরে সরিয়ে রাখা। একই সাবধানতা সাধারণ মুসলমান রমণীদের ক্ষেত্রেও অবলম্বিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ, আগুনের জাত-বিচার নেই—তা সে কারো গায়ে লাগুক বা লাগানো হোক।

অন্তরঙ্গিনাদের প্রতি ইংরেজ মহাপুরুষদের আকর্ষণের চিত্র সেদিনের বাঙলা নাটক, কাব্য বা উপন্যাসে বেশ দুলভ ছিলো। সেজন্যে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিককার সেই তীতি নারীদের অবরোধের অন্তগুহায় অবস্থানে বাধ্য করা অস্বাভাবিক নয়। তার সঙ্গে রয়েছে অধিকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আনুষঙ্গিক সুবর্ণ লাভে অত্যুগ্র ইচ্ছে—নারীদেহ যার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যে বাবু সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিলো তার বেলীমূলে নারীর বাসস্থানই সব চাইতে বেশি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। তবে বিবাহিতা স্ত্রী রেখে বাইজীর বাড়িতে বা প্রয়োজন উদ্যানে রাত কাটিয়ে আসা সেদিন তো সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গে পরিগণিত হয়েছিলো। নারীরাও সেদিন উপলব্ধি করতেন, যে পুরুষের একাধিক নারী নেই, সে আবার পুরুষ নাকি! নারীর এই অবস্থাননার পেছনে কাজ করেছিলো মানস-তাত্ত্বিক চিন্তা চেতনা। ইংরেজরা পরিচর্যার মাধ্যমে এই চেতনাকেই চিটিয়ে রেখেছিলো। বিধবা বিবাহ, কৌলিন্য প্রথাভূত বহুবিবাহ ইত্যাকার নানাপ্রকার অসুখ তখন তুঙ্গে। সতীদাহের তীব্রতা কমে এলেও, তার প্রতিক্রিয়া তখনো সমাজের প্রতিটি স্তরে বিরাজমান। সতীদাহের মতো প্রথা মুসলমান সমাজে চালু না থাকলেও বিধবা বিবাহ বেশ বেঁকে বসেছিলো। ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শত শত বিধবা মহিলার বিয়ে প্রদান করেছিলেন। ইসলাম ধর্মে বহুবিবাহ তো এমনিতেই সিদ্ধ—একত্রে চারটে বিয়ে করা যায়। মোটকথা নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাতে নারীর

অধিকার সঙ্কুচিত হতে হতে প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকেছিলো।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই নারীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি জোরালো হয়। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম নারীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করে নিয়েও এ জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ সত্যি বৈপ্লবিক। তবে তাঁর কোনও বিদ্রোহ চেতনা ছিলোনা বলেই তাঁর পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবু পথ তো তিনিই কেটে দিয়েছিলেন। সেই পথ ধরেই পরবর্তীকালে নারী স্বাধীনতার দৃপ্ত মিছিল এগিয়ে গেছে সামনের দিকে।

আর এখন? এই বিশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে নারী স্বাধীনতা কোন স্তরে ঠেকেছে! শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে পরিমাণে, মানে সম্মানে নারীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কোন সংশয়ই থাকে না। এমন কি মুসলমান নারীসমাজও এখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। মোল্লা-তন্ত্রের প্রভাব যেখানে যেভাবে বিস্তারিত হোক না কেন, মুসলিম নারীসমাজের আর পিছিয়ে যাবার আশঙ্কা বা অবকাশ নেই। মুসলিম জগতের কোন কোন রাষ্ট্রে নারীরা তো পাশ্চাত্য জগতকেও হার মানিয়ে দেছে। অবশ্য এসব কথা বলা হচ্ছে সাধারণভাবে সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেই সত্য, প্রেমের ক্ষেত্রে নয়। তবু মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আদৌ কি নারী সমাজ সত্যিকার অর্থে মুক্তিলাভ করেছেন? হয়তো কেউ কেউ আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে লাঞ্ছিত করে দিতে চাইবেন। তবু আমি নারীমুক্তিকে সেভাবে দেখতে চাই না। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের কোন কোন পর্বে আজ নারীর যে ভূমিকা তাকে নারীর জন্যে মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করা কি তার অবমাননা নয়? আগে নারীদেহকে ব্যক্তিগত ভোগের জন্যে ব্যবহার করা হতো—এখন তা ব্যবহৃত হচ্ছে সমষ্টির ভোগে। দুই একখানা হিন্দি ছবি বা বাংলা নাটক প্রেমে তাকে আবার 'পণ্যভোগ' আখ্যায়িত করতে ইচ্ছে করছে। কারণ এসব কার্যকলাপের একমাত্র উদ্দেশ্য নারীদেহের প্রদর্শনীর মাধ্যমে অর্থ-লাভ। কিন্তু আমি সত্যি নারীর মর্যাদায় বিশ্বাসী বলেই তা করতে পারছিনা। অথচ নারী সমাজ নির্বিকারে এসব মেনে নিচ্ছেন। সাহিত্য ও শিল্পচর্চার প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং অর্থের বিনিময়ে দেহ প্রদর্শনীর ভেতর পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারলে বুদ্ধি বোকামুক্তিই হতে বাধ্য। উপরন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দোহাই দিয়ে নারীকে যে ভাবে এখনো স্বামী বা তার বন্ধুর মাধ্যমে পৃথিবীর কাছে পরিচিত হতে হচ্ছে তাও নারীর পক্ষে সম্মানজনক নয়, বা একে সমান অধিকারও বলা যায় না। এ কারণেই কোন নারীর পক্ষে শুধু মানুষের মাঝে কোথাও দাঁড়ানো এখন সম্ভব নয়। তাহলে ব্যাপারখানা কি দাঁড়াচ্ছে?

আজ নারীরা এগিয়ে গেছেন সত্য কিন্তু পারিবারিক জীবনে এখনো পুরুষের সমান মর্যাদা ভোগ করতে পারছেন না। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এই মর্যাদাটুকুও বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নারীর এই স্বাধীনতার জন্যেই সংগ্রাম করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের বিমলা তো এই যুগেই তৈরী। নিখিলেশের নারীর স্বাধিকার বোধ উপলব্ধি করতে না পেরেই সে কিছু-কালের জন্যে বিপথগামী হয়েছিলো। আজও কেন নারীসমাজ সেই আত্মঘাতী পথ থেকে সরে আসতে পারছেন না?

ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে ?

রমেন নাগ

আমরা যখন বলি, ভারতের প্রায় অর্ধেক লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করেন, বা ভারত বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত বিশ্বের ষষ্ঠতম এবং শিল্পোৎপাদনে ভারত বিশ্বের দশম স্থান অধিকার করে তখন এক অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধী ধারণার সৃষ্টি না হয়ে পারে না। ভারত আজ আরব দেশের তেলক্ষেত্র থেকে তৈল আহরণ করে, কিন্তু ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের তিন চতুর্থাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন না, এমন কি বিরাট সংখ্যক ভারত-বাসী কেরোসিনের কুপি জ্বালাতেও পারেন না। ভারতে সবুজ বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয় কিন্তু সর্বাধিক সফল পাঞ্জাব-হরিয়ানাতেও ৪০ শতাংশেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন বলে যখন শুনি (বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা হিসেবে) তখন কোন উন্নতির পথে আমরা চলেছি তা হৃদয়ঙ্গম করতে রীতিমত কষ্ট হয়।

একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উচ্চ-মার্গ, অন্যদিকে দলে দলে বেকার ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, বিজ্ঞানীদের দেশত্যাগ আর জাতিসংঘের ঘোষিত বৃহত্তম নিরক্ষরের দেশ ভারতবর্ষের লোচনীয় শিক্ষাচিত্র। অসম প্রতিকৃতির মতই দৃষ্টি বিভ্রমকারী নয় কি ?

চৌত্রিশ বছরের উন্নয়ন চিত্র : এই অসাম্য, এই অসম বিকাশের চিত্র আমাদের দেশে গত প্রায় সাড়ে তিন দশকের বুর্জোয়া ঘুষ্বামী শ্রেণীর মতাদর্শ এবং পরিচালন ক্ষমতার পরিচয় বহন করছে। পাশাপাশি সাড়ে তিন দশকের গণ আন্দোলনও এই অসম বিকাশের বিরুদ্ধে শ্রেণীগত বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে গেছে এবং বেড়ে উঠেছে। শাসকশ্রেণীর কর্মধারার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুর্জোয়া-ঘুষ্বামী গোষ্ঠীর অপশাসনের গণতান্ত্রিক বিকল্প অন্বেষণ করেছে, কতকাংশে সাফল্যও লাভ করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা সামগ্রিক ভাবে বুর্জোয়া ঘুষ্বামী শ্রেণীরই হাতে থেকে গেছে। ফলে পর পর ছয়টি জাতীয় পরি-কল্পনার বিপুল অর্থব্যয় মূলতঃ বুর্জোয়া ঘুষ্বামী শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। কোন জাতীয় সমস্যারই সমাধান হয় নি।

ইতিমধ্যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবিরোধগুলি পরিপক্ক হয়ে উঠছে। ফ্রেডে-রিক্স অর্থনীতির বুর্জোয়া পাশচক্র আজ বিশ্ব অর্থনৈতিক পর্যায়েই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং পুঁজি-বাদী উন্নয়নের পন্থা আজ সুফল প্রসব করতে পারে না। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন সামাজিক স্তরকক্ষ মানুষের মধ্যে অবিরাম প্রতিক্রিয়া হিসাবে সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের প্রবণতা দ্রুতবেগে ব্যাপ্তি লাভ করছে। ফলে রাজ-নৈতিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এ আলোড়ন বহু নয়, বরং গোটা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবস্থান পরিবর্তনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন : সমগ্র বিশ্ব এবং ভারতীয় পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করে আমরা সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয় করতে পারি না। সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ না করে কোন দেশের বা বিশ্বের সামা-জিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করাও সম্ভব হয় না। কার্ল মার্কস তার উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রাক্কালে কমোডিটি বা পণ্যের গুণাবলীর সাধারণীকরণ করে দেখিয়েছেন যে সমস্ত পণ্যের সাধারণ রূপ হলো শ্রম। কাপড় চিনি, কেরোসিন, গম, দুধ, বিভিন্ন পণ্যের আলাদা আকৃতি এবং আলাদা প্রকৃতি। অভাব মোচনের সামর্থ্যও বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন রকম। মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন সমস্ত পণ্যের একমাত্র সাধারণ উপাদান হচ্ছে শ্রম। অতএব শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে।

একই ভাবে বিভিন্ন আপাতবিরোধী এবং বিভিন্ন প্রকৃতির পরিস্থিতির সাধারণীকরণ ছাড়া কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের বৈপ্রকৃতির বাসিন্দা কোটি কোটি মানুষের হাজারো রকম ঐতিহাসিক সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন এবং প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায় ও নিয়মকে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এই সিদ্ধান্ত থেকেই যুব লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কি করতে হবে তা ঠিক করা যায়।

ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি : ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতীয় অধিবাসীদের সংখ্যা এখন ৬৮ কোটিরও বেশী। এই জনসংখ্যার মধ্যে নানা ভাষাভাষী, নানা বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ রয়েছেন। এরা সবাই মিলে এক ভারতীয় জাতি গঠনের উপাদান একত্রিত করছেন।

ভারতীয় সমাজে হিন্দী ভাষাভাষী মানুষ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালী, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম প্রভৃতি জাতিসত্তা ছাড়া উর্দু, নেপালী ইত্যাদি কয়েকটি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তার উপরে রয়েছেন কয়েকটি উপজাতি, যেমন সাঁওতাল, মিজো, মণিপুরী, ত্রিপুরী, খাসি, গোন্ড, সাঁওতাল ইত্যাদি।

এদের সাধারণ লক্ষণ কোথায়? এমন কোন উপাদান এদের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে উপস্থিত? প্রথমতঃ এদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শ্রমজীবী। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, জল জঙ্গলে, গ্রামে শহরে এরা শ্রম করছেন, উৎপাদন করছেন। খনি গহ্বরে নেমে কয়লা, ধাতু, খনিজ তেল আহরণ করছেন, ক্ষেতে খামারে ধান ও কাঁচা মাল উৎপাদন করছেন, শিল্প কারখানায় পণ্য উৎপাদন করছেন, ব্যাঙ্ক, বীমা পরিবহন শিল্পে কাজ করছেন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সরকার ও সমাজ পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এদের হাতে প্রসারিত। পারস্পরিক শ্রমের আদানপ্রদানে এরা সবাই পরস্পর সংবদ্ধ। এরা সমাজের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ।

ফলে কারখানার পুঁজি মালিক, ক্ষেতে খামারে সমস্ত ভূস্বামী ও পুঁজিবাদী খামার মালিক, সরকারী আমলা শ্রেণী এবং সমাজের উচ্চবিত্ত অল্প কয়েকজন ব্যক্তিরা শ্রমজীবী মানুষের শ্রম কেনাবেচা করে, শ্রম খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে এবং সম্পদ অধিকার করে। এরা সমাজের পাঁচ শতাংশেরও কম।

আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র: একথা ঠিক দেশে স্বাধীনতার পর সংবিধান রচনা করা হয়েছে। সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার, দায়বদ্ধতন্ত্রী সরকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা এরকম অনেক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। সার্বভৌম অধিকার জনগণের মধ্যে নিহিত। জনগণের নির্বাচিত সংসদ কেন্দ্রে এবং বিধানসভাগুলি রাজ্যে এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সংবিধানে একহাতে যা দেওয়া হয়েছে অন্য হাতে তা হরণ করা হয়েছে। এখানেই ভারতীয় সংবিধানের দুর্বলতা। এই দুর্বলতার ছিদ্রপথে বৈরাচার ও আধা ফ্যাসিবাদের কালনাগিনী গণতন্ত্রকে বারে বারে ছোবল মেরেছে। ফলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করা না হলে ভারতে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের খোলটাকেও রক্ষা করা যায় না। সংবিধান-নিহিত অধিকারগুলি যাতে কাগজের দলিল হয়ে যায়।

তদুপরি পাঁচবছর পর একবার ভোট দেওয়ার অধিকার এবং তার পরবর্তী পাঁচ বছর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ

জাতির সেবায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প নিগম

নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থায় অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল সরবরাহে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়নে আমাদের অগ্রগতি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের শিল্প উপনগরী আজ নূতন উদ্যোক্তাদের শিল্প তাবনার প্রথম আশ্বাস। এই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারী এবং বিত্ত উদ্যোগে অবিলম্বে একাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা গড়ে তোলার এক পরিকল্পনায় আমরা হাত দিয়েছি। কর্মসংস্থান ছাড়াও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য নূতন উদ্যোক্তা তৈরী করা। বিপণন সহায়তায়ও আমরা সম্প্রতি এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছি। ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশে আমরা সর্বিক সবার সহযোগিতা প্রার্থী।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

(৪র্থ তল)

কলিকাতা-৭০০০১৩

হারিয়ে চুপ করে বসে থাকা এটা গণতন্ত্রের পরিচয় নয়। গণতন্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার রাষ্ট্রীয় রূপ। শুধু আনুষ্ঠানিক ভোটদানের অধিকারই যথেষ্ট নয়। মার্কসের ভাষায় আনুষ্ঠানিক ভোটদানের অধিকার কেবল সাধারণ মেহনতী মানুষের কাছে একদল শোষকের বদলে অন্য একদল শোষককে নির্বাচিত করার অধিকারই বোঝায়। কিন্তু বুর্জোয়া ক্ষুধার্ত শ্রেণীগুলির সংকটের মুখে এই আনুষ্ঠানিক ভোট দেবার সামান্য অধিকারটুকুও শোষকশ্রেণীর হাতে আক্রান্ত। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণী এই আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রকেও জাল, জুয়াচুরি ও সন্ত্রাসের দ্বারকতে বিনষ্ট করে দেয়। আজ সাম্রাজ্যেই তা প্রসারিত হয়েছে। গাভোয়াদ ক্ষেত্রে এমন ভয়ংকর ভাবে আনুষ্ঠানিক ভোটদানের অধিকার আক্রান্ত হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনারও তা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। এইচ এন বহুগুণা সংগত বলেছেন, কাজের অধিকার নেই, শিক্ষার অধিকার নেই, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, শুধু ছিল আনুষ্ঠানিক ভোটদানের অধিকার, এবার সেটাও হরণ করা হল।

সংকটের চেহারা : কেন আজ বুর্জোয়া ক্ষুধার্ত শ্রেণী আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রটুকুও ধ্বংস করতে চায়? কারণ তারা বর্তমান যুগে শ্রেণী শোষণের পুরনো পদ্ধতি টিকিয়ে রাখতে পারছে না। সামন্তবাদী আমলে জনগণের উপরে আক্ষরিক অর্থেই শারীরিক অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হত, রাজা বা সামন্তপ্রভু একাধারে আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বিচারের কর্তা ছিলেন। স্বর্গে ভগবান যত্তো রাজা আর পাতালে শয়তান নিয়ে যুগ যুগীয় ধারণা জনমনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। কিন্তু উৎপাদন বিকাশের বাস্তব প্রবৃত্তি এই ধারণাকে কিকে করে আনে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র হয় উচ্ছেদ হয় নয়তো বিভাস আনুষ্ঠানিক অর্থে অক্ষিত বজায় রাখে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বুর্জোয়া উৎপাদন প্রথা সামন্তবাদের ভূমিদাসকে মুক্ত করে তাকে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দেয়। আইন ও সংবিধানগত রক্ষাকবচ দেয়। সংবাদপত্র, মতামত প্রকাশ, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত অধিকার দেয়। কিন্তু এগুলির আড়ালে ক্ষুধার ক্ষুধিত সাধারণ মানুষকে বেঁধে রাখে। তুমি আমার জমি চাষ করবে কি করবে না সে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা। কলেকারখানায় কাজ করা না করা তোমার স্বাধীন ইচ্ছা, সংবাদপত্র পড়া না পড়া তোমার স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু এরই আড়ালে থাকে এক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা যা ক্ষুধা ও বঞ্চনা সৃষ্টি করে চলে। ক্ষুধার জ্বালা মানুষকে যে কোন শর্তে তার শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য করে।

কিন্তু পুঁজিবাদের দুনিয়ার ক্ষুধা সাধারণ নিরন্ন মানুষের মহাধুরুক্ষা থেকেও ভয়ংকর। সুতরাং তারা সাধারণ মানুষের উপর চরমতম শোষণ চালিয়ে যায়। তাদের নিরন্ন করে, কর্মহীন করে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিপ্রবাহ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মেই একদিন অবাধ প্রতিযোগিতার নিয়ম উঠে যায়, একচেটিয়া পুঁজির উত্থান ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে রাষ্ট্র-একচেটিয়া পুঁজির জোটে পরিণত হয়। একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ বিকাশের অমোঘ নিয়মে একচেটিয়া পুঁজি-সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে সামন্তবাদকে টিঁকিয়ে রাখে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। ফলে কাজেই উপনিবেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা মুক্তি অর্জনের অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়। অর্থাৎ যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করে স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষা কোনটাই সম্ভব হয় না। যেটুকু স্বাধীনতা আছে তাকেও হারাতে হয়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এর বড় দৃষ্টান্ত।

ভারতের পরিস্থিতি : যে দেশগুলির উল্লেখ করলাম সেই দেশগুলি আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধিকার বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালে আমাদের দেশেও ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারগুলি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমী দুনিয়ার বহুবিজ্ঞাপিত বৃহত্তম গণতন্ত্রে সংবাদপত্রে সন্তানমিতিতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই শুধু নয়, আইনের আশ্রয়ে নিজ নিজ গৃহে শান্তিতে অবস্থান করা, অবাধে চলাফেরা করা পর্যন্ত প্রায় বাতিল হয়ে যায়। কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদের অংশ হিসেবে ভারতীয় পুঁজিবাদ আপন অবিরোধিতার চরমকটে সংকটে জড়িয়ে পড়েছিল। এই সংকট থেকে মুক্ত হবার উপায় আরো বেশী করে জনগণকে শোষণ করা, আরো বেশী শক্ত করে শাসনের যন্ত্রকে দিয়ে জাতিকে শৃঙ্খলিত করা। সুতরাং মিসা, কাসা, এসমো, সি বি আই, র, সি, আর সি, সি, আই, এস, এফ-এর আবির্ভাব। অবশেষে গণতান্ত্রিক সংবিধান বিলোপ, হিটলার, মাসোলিনি, মুসোলিনি, চেঙ্গিস, তিনশূলাদনের দলে নাম লেখানো একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা অত সহজ নয়। গত তিনচার বছরের মধ্যে সংকটের চেহারা

এমন ভয়ানক হয়ে উঠেছে যে শাসকশ্রেণীর পক্ষে চাঁদ সাদাদাবো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস হল বুর্জোয়া ভূস্বামী চক্রের প্রতিনিধি হিসেবে এদেশে প্রায় একচেটিয়া শাসন চালিয়ে এসেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী জনগণ নিয়মে এই চক্রেও ভাঙন ধরেছে। বৃহৎ, একচেটিয়া পুঁজি মাঝারী ও ক্ষুদ্রকায় পুঁজিকে গ্রাস করছে। চক্রের ওপর পরিক ভূস্বামীগোষ্ঠী কৃষি উৎপাদনে পুঁজিবাদী ধারায়, ধনী কৃষক প্রায় প্রত্যেকের স্বার্থই সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ছোট স্তরের এদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতি বিপন্ন। এক কথায় শাসকশ্রেণীর ভোট অর্থনৈতিক সংকটের নিয়মে ভেঙে পড়ছে। কোন এক মুহূর্তে তারা হয়তো সাময়িক ভাবে বোঝাপড়া করতে সমর্থ হতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে নয়। কারণ আজ চটকল মালিক, চিনিকল মালিক, কাপড়ের কল মালিক কেউই পাট, আখ, তুলো ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্যের লাভজনক দাম দিতে রাজী নয়। এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মহারাষ্ট্রে তামিলনাড়ুতে অন্ধ্রে পাঞ্জাবে দেশের প্রায় সর্বত্র।

অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও চেতনা বেড়েছে। দেশের মূল রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসে পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন অর্জনে উদ্যত। কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামপন্থী শক্তির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার জনগণের ব্যাপক ধারণায় গুণগত পরিবর্তন আনার ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদনমুখী শক্তির বিন্যাসও বাম ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার অনুকূল। সংগঠন গড়ে উঠছে, চেতনা বাড়ছে, গণ-আন্দোলন ক্রমবর্ধমান বিকাশ লাভ করছে। আজ সারা ভারতে সংগঠিত কৃষকের সংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ, সংগঠিত শ্রমিক বাহিনীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ. ব্যাঙ্ক-ভায়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, বীমা ও সওদাগরী অফিসের কর্মী নিজ নিজ সংগঠনে জমায়েত।

কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখনো শোষিত জনগণের এক বিরাট অংশ রাজনৈতিক-সাংগঠনিক চেতনার বাইরে রয়ে গেছেন। প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরার জনশক্তির প্রসার ঘটেছে। অন্যান্য রাজ্যে এখনও এই প্রসারের গতি আশানুরূপ নয়। জনগণের বিভিন্ন প্রগতীশীল অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে সত্য কিন্তু সমগ্র দেশে শক্তির ভারসাম্য এখনো নিশ্চিতভাবে জনগণের পক্ষে চলে আসে নি। এই পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন আজ অত্যন্ত বেশী। এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলেই দেশে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের করায়ত্ত হবে।

গণআন্দোলনের গুরুত্ব : জনগণের চেতনা বিকাশ করার জন্য কোন বিকল্প নেই। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনই জনগণের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তাদের পথ দেখাতে পারে। গণআন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংগঠিত করতে না পারলে তার পশ্চাদ্গতির সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আবার সংগঠন একমাত্র তখনই সম্ভব হয় যখন শ্রমজীবী জনগণের আশু লক্ষ্যকে অবলম্বন করে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে জনগণকে পরিচালিত করার মত রাজনৈতিক পার্টি থাকে। এমন এক রাজনৈতিক পার্টি যার কর্মীরা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং চরম ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলে এমনি একটা রাজনৈতিক দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পেরেছে। গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনগুলিকেও এই ঐক্যের মূলে যুক্ত করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যকে একটা নির্বাচনী ঐক্য বা সমঝোতা বলে ধরে নিলেই হবে না। সেটা হবে এক আনুষ্ঠানিক ঐক্য। কর্মসূচীগত ঐক্য ছাড়া বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার অর্থ থাকে না। মিলিত গণআন্দোলন ছাড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত থেকে এই কথা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার আকাশ থেকে পড়ে নি। অতীতের অসংখ্য কৃষক আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনের ধারা বামপন্থী ধারাকে পুষ্ট করেছে। মাঝে মাঝে দুর্যোগের কালে এই ঐক্য খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের শক্তি আবার এই শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। শাসকশ্রেণীর নীতি ও কর্মপন্থাও এই ঐক্যকে দৃঢ় করেছে কারণ অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণপ্রতিরোধ জনগণের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে। যখন জনগণের বিভিন্ন অংশ গণআন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাদের ঐক্য তাদের প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলগুলিকেও ঐক্যবদ্ধ করে। শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের বিভিন্ন গণআন্দোলন বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। একদা যারা বামপন্থী ঐক্যের শিবির পরিত্যাগ করেছিলেন সেই সি পি আই, সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলও আজ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শরিক হয়েছে।

স্বৈরতন্ত্রী কংগ্রেস সরকারের অভিত্যাজ্য রাজ, ভাতা, এসমো প্রভৃতি জরুরি আইন, বৈদেশিক সাহায্যের নামে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, বাজেট বিকৃত করে সংসদের অধিকার খর্বন

করে পরোক্ষ কর আদায়ের ছলনা এবং আজকে প্রমুখ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের অমল দুর্নীতি—এ সমস্ত ঘটনাই বামপন্থী শক্তি বহির্ভূত জনসাধারণকেও বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জমায়েত হতে উৎসাহী করে। গতবছর অক্টোবরে মহারাষ্ট্রের কিষাণ মোর্চার বন্যা-প্রবাহের মত নাগপুরে বিধানসভা অবরোধ, এবছর ২৩শে মার্চ মহারাষ্ট্রীতে বিরাট কৃষক সমাবেশ দেখিয়েছে যে মেহনতী জনগণের উদ্যোগ প্রস্তুত গণতান্ত্রিক শক্তিকে বামপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে। কয়েক তখন চ্যবন, জগজীবন রাম বা স্বরণ সিংদের এই ক্ষমতা নেই।

বুর্জোয়া স্বাধীনতার পতাকা : কমরেড স্তালিন বলেছিলেন বুর্জোয়া স্বাধীনতার পতাকা যখন ধূলায় লুণ্ঠিত তখন তাকে উর্দ্ধীন রাখা কমিউনিষ্টদেরই কর্তব্য। যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট বুর্জোয়া স্থায়ী শাসক-গোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পতাকা পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করে, সেই সংকটের মোকাবিলা করার জন্যেই কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরতে হয়। এটাই তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। কারণ বৈরতন্ত্র যখন জনগণের জীবন জীবিকার ধারাকে অনবরত আঘাত করে তখন তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতাকেও স্বীকার করে না। নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব রক্ষা করে চলে না। ১৯৭৭ সালে আমাদের দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চন্দ্রশেখর, কংগ্রেস সংসদীয় দলের সম্পাদক রামধন, কৃষ্ণকান্ত সহ বহু কংগ্রেসী নেতাও রেহাই পান নি। জগজীবন-রাম, ওয়াই বি চ্যবন, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়, স্বরণ সিংএর মত লোক যারা বৈরতন্ত্রের বিভিন্ন পদক্ষেপে সহায়তা করেছিলেন এবং এখন আবার আত্মগ্লানিপ্রসূত নাকখত দিয়ে বৈরতন্ত্রের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করার অভিলাষী তারাও বৈরতন্ত্রের হাতে কিল চড় খাননাকা খান নি এমন নয়।

সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন কমিউনিষ্ট এবং অন্যান্য বামপন্থী শক্তির পক্ষে অপরিহার্য। এই দায়িত্ব পালন করার প্রক্রিয়া ব্যাপক জনগণের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব সুনিশ্চিত করে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলে দেখা গেল। সারা দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রাথমিক শর্ত বুর্জোয়া স্বাধীনতার পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরা। কারো কারো যদি একে তুচ্ছ বা পশ্চাদপদী বলে মনে করার ঔদ্ধত্য থেকে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী শক্তি ও তার মোর্চার ক্রমাগত শক্তি অর্জনের ঘটনা লক্ষ্য করে তারা ভ্রান্তিমুক্ত হতে পারেন।

গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র : জনগণের বিভিন্ন অংশের ঐক্য রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যকে যখন শাসকশ্রেণীর অপসারণের অনুকূল পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করে তখন শাসকশ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা প্রকট হতে থাকে। গণ আন্দোলন সব সময় হাতে হাতে ফল এনে দেয় না। কিন্তু অধিকাংশ গণ আন্দোলনের একটা নিশ্চিত পরিণতি থাকে। ১৯৬৯ সালে খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস দলকে প্রথম ক্ষমতাচ্যুত করার অন্যতম শক্তি যদিও খাদ্য আন্দোলনে সামান্য রেশন বৃদ্ধির দাবী আদায় হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়। অথচ ঐ সময়ের কাছাকাছি ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে সারা দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল এবং এই কলকাতা শহরে সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রীকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাবেশে অভিনন্দিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও সারা দেশে ১৯৬৭ সালে নানা ধরনের গণআন্দোলন, কৃষকদের আন্দোলন এবং শ্রমিক ধর্মঘটের প্রভাব ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে নয়টি রাজ্যে শাসক কংগ্রেস দলের পরাজয় ঘটায়।

এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? গণ আন্দোলনের বৃদ্ধির আনুপাতিক পরিবর্তন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম করে। লেনিনের কথা, "যদি কেউ একটা "বিশুদ্ধ" সমাজ বিপ্লব দেখার আশা করে, তাহলে জীবনে কোন দিন তা তার দেখা হবে না। এ ধরনের লোক নিজে কি তা না বুঝেই মুখে কেবল বিপ্লবের কথা আওড়ায় .....ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনগ্রসরভাবে ও পৃথক পৃথক ভাবে অত্যাচারিত ও অসন্তোষ-বিক্ষুব্ধ জনগণের গণ-সংগ্রামের একটা বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অপরিহার্যভাবেই পেটি বুর্জোয়া ও অনগ্রসর জনগণের কোন কোন অংশ গণসংগ্রামে যোগ দেবে—এদের অংশগ্রহণ ছাড়া তার সংগ্রাম অসম্ভব। এ ছাড়া কোন বিপ্লবই সম্ভব হয় না। কিন্তু অনুরূপ অপরিহার্যভাবেই গণআন্দোলনের মধ্যে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কার, ধ্যানধারণা, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবিলাস, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি নিয়ে আসবে কিন্তু বাস্তব দিক থেকে তারা পুঁজিকে আক্রমণ করবে। বিপ্লবের শ্রেণী সচেতন অগ্রবাহিনী, অগ্রগামী সর্বহারা শ্রেণী এইরকম একটি নানা রংয়ের নানা বৈচিত্র্য নানা স্তরের এবং বাইরে থেকে দেখলে যাকে খণ্ডবিখণ্ড বলে মনে হয় সেই জনতার গণসংগ্রামের এই বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করে একে ঐক্যবদ্ধ ও পরিচালিত করে ক্ষমতা অধিকার করতে পারবে, যে সমস্ত একটেটিয়া গোষ্ঠী বা ট্রাষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সবাই ঘৃণা করে সেগুলি এবং ব্যাঙ্কগুলিকে অধিকার করতে সক্ষম হবে। এবং অন্যান্য এমন কতগুলি ব্যবস্থামূলক

ব্যবহা গ্রহণ করতে পারবে, সাময়িকভাবে যার অর্থ চাষাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের জয়। কিন্তু তাহলেও নিজেকে পেটিবুর্জোয়া খাদ থেকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করতে পারবে না।" (লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী ২২শ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬৩। বোল্ড লেখকের)

লেনিন আবার বলেছেন,—"আপনারা গণআন্দোলনে এমন হাজার হাজার পার্টি বহির্ভূত শ্রমিককে পাচ্ছেন যারা সাধারণতঃ সব ব্যাপারে উদাসীন এবং একান্ত বিষয়ী জীবনযাত্রার অভ্যন্ত কে নরকুলে কারক্লেশে জীবনের বোঝা বহন করে, রাজনীতির কোন কথাই তারা শোনে না, তারাই যখন বিপ্লবের প্রস্তুতি থেকে বিপ্লবীর মত কাজ শুরু করে, তখন জনগণ সম্পর্কে আগেকার ধারণা বদলে যায়—একটা তখন অন্য কিছু বোঝাতে শুরু করে। "জনগণের" ধারণার পরিবর্তন আসে, তা সংখ্যাগরিষ্ঠকে বোঝায় অর্থাৎ শোষিত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বোঝায় কেবল শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই নয়। একজন বিপ্লবীর পক্ষে অন্য কোন অর্থ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং শব্দটির অন্য কোন অর্থ অযৌক্তিক এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।" লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী ৩২শ খণ্ড পৃঃ ৭১-১৮৮ বোল্ড লেখকের)

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট: সুতরাং "বিশুদ্ধ" সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন কল্পনা করা বাস্তবসম্মত নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছাতে হলে "শোষিত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে" ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির শোষণে বিপর্যস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারী পুঁজিপতি ধনী কৃষক থেকে শুরু করে গ্রাম ও শহরের কৃষক, ক্ষেতমজুর, অসংগঠিত শ্রমজীবী জনগণ—সবাইকে সাধারণ কর্মসূচীর ব্যাপারে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে গণ আন্দোলনে সামিল করতে হবে। একমাত্র একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর পার্টিই করতে পারে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পাদকশ্রেণীর এক অংশ অপর কোন অংশের বিকল্প হতে পারে না। জনতা, লোকদল ইন্দিরা কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা ইতিবাচকভাবে দেখিয়েছে যে একমাত্র বামপন্থী শক্তিগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের মেহনতী জোটই একমাত্র ইন্দিরা কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারে।

আজ যখন সংসদ ও অধিকাংশ রাজ্য

শরৎ এল। ঘরে ঘরে ছুটির নিমন্ত্রণ।
পৌঁছে দিল আকাশের লঘুপক্ষ মেঘ।
ফুলের সৌরভে আমোদিত বাতাবরণ।
আসুন। বেরিয়ে পড়ি। ক্লান্ত কোলাহল
থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির শুশ্রূষায়
বিজনতায়। সাদর অভ্যর্থনায়
প্রতীক্ষা-চঞ্চল সিন্ধু। স্থির পর্বত।
আর, মন্দিরার মৃদুতানে মূর্ছিত মন্দির।
আপনার এই নিমন্ত্রণের
সানন্দ সঙ্গী আমরাও।

আপনাদের নিরন্তর সেবায় রতী
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

বিধানসভায় ইন্দিরা কংগ্রেস দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়েছে তখন জনগণের পক্ষে সংসদের বাইরেকার গণ আন্দোলনের অনেক বেশী গুরুত্ব দেখা দিয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন ইস্যুতে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তির এক জোট গঠন করা সম্ভব হতে পারে। যখন এইরকম একটা ঐক্য গড়ে উঠবে তখন তারপর পর তরঙ্গ গণ আন্দোলন এই ঐক্যকে বিপুল শক্তিশালী করে তুলবে। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে নির্বাচনী বিজয় সহজসাধ্য। যদি শাসক শক্তি অবাধে ভোট দেবার অধিকার হরণ করার চেষ্টা করে তাহলেও জনগণের বাম ও গণতান্ত্রিক জোট ঐ অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেবার সামর্থ্য রাখে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি জনগণের পক্ষে : ইন্দিরা কংগ্রেস আজ সংসদ ও অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভায় বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকটের সমুখীন হবার মত সামর্থ্য তাদের দিন দিন কমে যাচ্ছে। শাসক দলের অভ্যন্তরেই মর্যাদাহীন আত্মকলহ এবং লজ্জাজনক দ্বন্দ্ব মনোভাব জনগণের চোখে তাদের হেয় করে তুলছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরা সরকারকে অস্থায়ী করার দলীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সামর্থ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের কতখানি আছে জানি না কিন্তু জনগণ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ পাহাড়িয়াকে সরে যেতে হয়েছে। আনজাইয়া-গুণ্ডুরাও, আনতুলে কতদিন থাকবেন তা অনিশ্চিত। ভজনলাল, রামলাল, দরবারা সিং, বিহারের জগন্নাথ মিশ্র সবাই আজ নিজ নিজ পদ বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত নন।

ইন্দিরা সরকার অর্থনৈতিক সংকটের চাপে বিপুল বৈদেশিক ঋণ প্রার্থনা করে অর্থনীতিকে আরো অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জাতীয় অর্থনৈতিকে বন্ধক দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ইন্দিরা গান্ধী নিজেই বলেছেন আজ দেশের সামনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিপদ গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। অতীতে আর কোনদিন নাকি এমন হয় নি।

কিন্তু এই আসন্ন বিপদের সামনে শাসক দল ইন্দিরা কংগ্রেস পথ দেখাতে পারছে না। তারা মালা, এসমোর অস্ত্র দিয়ে মেহনতী মানুষকে আঘাত করতে উদ্যত। এক হাতে সাম্রাজ্যবাদের কৃপা ভিক্ষা, অন্য হাতে অভিজাতদের প্রহরণ। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ আজ একটি মাত্র পরিবারের রাজনৈতিক স্বার্থে ক্ষুদ্রতম গণ্ডীতে আবদ্ধ। কাজে কাজেই বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দলের মর্যাদা দিনদিন কমে যাচ্ছে। ফলে জনসাধারণকে পরিচালিত করার সামর্থ্য এদের দিন দিন কমে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন ইন্দিরা কংগ্রেসের যখন এই অবস্থা তখন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী দলের অপরাংশ কংগ্রেস (আ) জনতা, লোকদল খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। একদল 'ঘরে ফেরার' প্রতীক্ষায় ইন্দিরা কংগ্রেসের দুয়ারে বসে আছে অন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে হতাশায় মুহ্যমান।

এদের কারো পক্ষেই আসন্ন সংকটের সময় জাতিকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইন্দিরা কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প হিসেবে বাম ও গণতান্ত্রিক জোটের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ইন্দিরা কংগ্রেসের গতিবিধি দুর্বল হয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের হাতে চলে যাচ্ছে। এই সময়ে সংসদের বহির্ভূত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অসীম তাৎপর্য রয়েছে। কারণ এই আন্দোলন উপযুক্ত নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে উঠলে শুধু যে গণতন্ত্র রক্ষার লক্ষ্যেই সিদ্ধ হবে তাই নয়, অদূর ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক শক্তি আমূল পরিবর্তনের পথেও অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।

দুর্যোধন যেখানে দেবতা

সজল সেন

"তুমি যদি তোমার দুটি ছেলেকে সমান ভালবাসা দিয়ে সমানভাবে ভালবাসতে পার তবে আমি কেন আমার চারটে স্বামীকে স্বামীভাবে ভালবাসতে পারব না? তবে হ্যাঁ, একথা বলতে পার সবাইকে ঠিক ঠিক সমান ভাবে ভালবাসতে পারি না। কিন্তু কিন্তু স্বামীর প্রতি ভালবাসার পরিমাণ সামান্য একটু কম বেশী হয়েই থাকে। যেমন মা তার সব কটি ছেলেকে ঠিক সমান ভাবে ভালবাসতে পারে না, কোন ছেলেটার উপর টান একটু বেশী থাকে, কোনটার পরে টান একটু কম থাকে।" চায়না মুখার্জিকে তার প্রশ্নের উত্তর দিল রাঙাথাইনের যুবতী সুন্দরী বধূ কুলবতিয়া।

যমুনোত্তরীর সোজা উত্তর দিকে অবস্থিত বন্দরপুঁছ হিমবাহ থেকে উৎপন্ন কইনাড়ি গাড় ও কাপিরোহিন্দি পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত যমুনার হিমবাহ থেকে নেমে আসা হরকিপুন নালা একসঙ্গে মিশবার পর তার নাম হয়েছে টন্স উপনদী। এটি যমুনার সবচেয়ে বড় উপনদী। উৎস থেকে কিছুটা নেমে আসবার পর কিয়ার ডেরার বাদপা এলাকা থেকে রূপিন নামে একটি পাহাড়ী নদী এসে মিশেছে টন্সএর সঙ্গে। সঙ্গম স্থলের নাম নৈটেয়ার। টন্স বা সাধারণ বাঙালীদের ভাষায় তমসা নদীর উৎস থেকে নৈটেয়ার পর্যন্ত এলাকা আপার টন্স ভ্যালী বা রাঙাথাই উপত্যকা নামে পরিচিত। রাঙাথাই-এর দক্ষিণে তমসা ও যমুনার সঙ্গমস্থল বা চক্রতা পর্যন্ত এলাকা লোয়ার টন্স ভ্যালী বা জৌনসার উপত্যকা নামে পরিচিত।

ট্রেকার নামে কলকাতার একটি পর্বতারোহী সংস্থার আমরা কয়েকজন সভ্য ও সভ্যা গিয়েছিলাম এই রাঙাথাই অঞ্চলের পাহাড়ী পথে ট্রেকিং করতে। আমরা এসে পৌঁছলাম তমসা উপত্যকার শেষ গ্রাম ওসলায় এবং আশ্রয় নিলাম গ্রামের প্রান্তে বনবিভাগের বিশ্রাম ভবনে। ওসলা ভাকবাংলোতে আসতে দেখে গ্রামের যত মেয়ে পুরুষ এসে উৎসুক চোখে আমাদের দেখতে থাকে। আমাদের দলের একমাত্র মহিলা সদস্যা চায়না মুখার্জি আশ্রয়ের সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে। গ্রামের একটি সদ্যবিবাহিত যুবতী কুলবতিয়ার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে চায়না জানতে পারে তার বিয়ে হয়েছে এই গ্রামের একটি পরিবারের চার ভাইয়ের সঙ্গে। তমসা উপত্যকায় বহুপতি প্রথা আছে এটা ওরা শুনে এসেছিল। সুযোগ পাওয়া মাত্র চায়না মুখার্জি কুলবতিয়াকে প্রশ্ন করে তুমি এতগুলি স্বামীকে একসঙ্গে কিভাবে ভালবাস? চায়নার ঐ প্রশ্নের জবাবে কুলবতিয়া প্রথমোক্ত কথাগুলি বলে।

আসবার পথে আকস্মিকভাবে দেখা হয়েছিল এবং আলাপ হয়েছিল দেরাদুন বিভাগের বিভাগীয় বন-অধিকর্তা মিঃ তাবিনের সঙ্গে। মিঃ তাবিন যেমন দক্ষ বিভাগীয় কর্মী তেমনি স্থানীয় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তার জ্ঞানও প্রচুর। তাঁরই মুখে শুনলাম রাঙাথাইয়ের প্রাচীন ইতিহাস।

খ্রীঃ অব্দের আনুমানিক ছ হাজার বছর আগে মধ্যএশিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বিচরণকারী আদিম যাযাবর নরগোষ্ঠীর ঐখানে স্থানাভাব হওয়ায় তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওদেরই একদল চলতি এগিয়ে যায় ইরাণের দিকে। শতাব্দীকাল একসঙ্গে বাস করবার পর ইরাণ আগত দলের একটি ক্ষুদ্র অগ্রগামী দল উত্তর পূর্বদিক থেকে ভালকন্দ হয়ে বলাকারে ঘুরে হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (Advance guard of the great mass of orginal Indoirnanians—History of Gawn Child) এবং যাযাবর পশুপালক হিসাবে হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় বসবাস করতে থাকে। এরা আদি খশ নামে পরিচিত। কাস্পিয়ান (খশ সিয়ন), ককেসাস (খশ-শাস), খশবিন, হিন্দুকুশ (হিন্দুখশ) কাশ্মীর (খশ-মীর) প্রভৃতি নাম এই আদি খশদের স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিক গ্রীয়ারসন বলেন এরাই ভারতে আদিমতম অনুপ্রবেশকারী দল।

এই জনগোষ্ঠীর যে অংশ ইরাণে রয়ে গেল তারা প্রকৃতির অকৃপণ দানে বহুকাল শতাব্দীকাল খুব ভালভাবেই কাটাল। প্রাচুর্যের ফলে এদের মধ্যে এল চিন্তাশীলতার সুযোগ। সৃষ্টি হোল বেদের প্রথম পর্যায়।

জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বেড়ে চলে। বৈদিক ইন্দোইরাণিয়ন গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা দেয় বহু সমস্যা। এরাই তখন দলে দলে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে এসে ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। এদের প্রবেশের যার ছিল প্রধানতঃ খাইবার বোলান প্রভৃতি গিরিবর্ত্ম। এরা এসে প্রথমেই আশ্রয় নিল সপ্ত সিন্ধুর তীরে সমতল ভূমিতে। তখন তারা আরাধনা করছে সপ্ত সিন্ধুর অধিপতিকে। ("হুমেবো অসি বরুণ যস্ত তে সপ্ত সিন্ধবঃ ঋগ্বেদ ২।২৮।৪)। ভারতে অনুপ্রবেশ করেই

তাদের সমুদ্রীন হতে হোল আর্যপূর্ব নিম্ন উপত্যকার আদিবাসীদের যাদের তারা বলত অসুর। এই আর্যপূর্বদের সঙ্গে প্রাথমিক সংঘাত, তাদের অবজ্ঞাকে হত্যা করা ও পরে দাসীকরণের প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ঐতিহ্যতে ও।

"যা পঞ্চ পর্বতেষু ক্ষিতয়ঃ চরামিস্তাং
সবন্ধবিষ্কং
তমায়ামামঃ যো অস্মি ধ্যান দাসুং পরাবং
ন জমান ইন্দ্রঃ
ঋগ্বেদ—১।১২।১৭

আর্যপূর্বদের সঙ্গে সংঘাত ও দাসীকরণের ভিতর দিয়ে বৈদিক আর্যরা প্রথমে পঞ্চনদ ও পরে সমতল ভূমি ধরে পূর্বদিকে গাঙ্গের উপত্যকায় এগিয়ে চলে। দাসীকরণের ফলে ও সমতলে যাযাবর পশুপালক বৃত্তি ত্যাগ করায় ফলে এরা নিজেদের আদি বহু আচার আচরণ ত্যাগ করে ও নোতুন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোকাচার এদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

ভারতে প্রথম অনুপ্রবেশকারী খশেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একদল কাশ্মীরে, একদল কিন্নরে একদল পীর পাঞ্জাল গিরিগাত্রে ও কেউ কেউ অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যে দলটি উচ্চতমদেশ উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা ঐ এলাকার যাতায়াতের দুর্গমতা, তমসা উপত্যকার উর্বরতা ও অন্যান্য সুযোগের জন্য বহির্বিশ্বে যেতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে ঐ এলাকার খশ বা রাওয়াইনরা একই জায়গায় যুগ যুগ ধরে থেকে যায়। আদিম খশ সংস্কৃতি ও লোকাচার যা সহস্রাব্দী কাল পূর্বে হিমালয়ের বুকে বিচরণকারী সমস্ত খশেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেগুলি হাজার হাজার বছর ধরে তমসা উপত্যকায় অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেছে। (The high land regions of Himalayas are but a residual cultural Island, which preserves social customs that had once a far more extensive distribution—Mother by Mr. Befault)

রাওয়াইনদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মিঃার তাদির জানিয়েছিলেন: জীব মাত্রেরই জীবন বিকাশের স্বাভাবিক প্রয়োজনে জৈব সঙ্গিনীর প্রয়োজন কিন্তু যে কোন নির্বিচ বিবাহ প্রথার মূলে জৈবিক বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়াও বংশ রক্ষার জন্য সন্তান সৃষ্টি ও নিজ নিজ পরিবেশ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের এবং সমগ্র গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা আছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তৈরী করেছে সামাজিক অনুশাসন এবং সামাজিক অনুশাসনের সর্বত্রই প্রথম ও প্রধান ধারাই হয়েছে বিবাহ বিধি। সামগ্রিক মঙ্গল চিন্তায় উদ্ভূত এবং অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত অথচ জৈবিক আনন্দ তৃপ্তির দ্যোতক এইরূপ সকল সমাজেরই বিবাহবিধি তাদের চোখে অতি মধুর এবং উদ্ভিত। রাওয়াইনদের সমাজব্যবস্থা মূলতঃ পিতৃকেন্দ্রিক অথচ যুক্ত স্বামী প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এদের বিয়ের নিয়ম হচ্ছে একই মেয়েকে পরিবারের সব কটি ভাই মিলে বিয়ে করবে। এবং সেই স্ত্রী সব কটি ভাইয়ের সঙ্গে সমানভাবে পুরোপুরি স্ত্রী হিসাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। যদি কোন স্ত্রী অপুত্রক হয় তবে সব কয় ভাই মিলেই আবার অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবে। অপুত্রক নারী এদের সমাজে অনাদৃতা তো হয়ই, অবাঞ্ছিতাও। অনেক সময়ে এমন ঘটনা ঘটে একই স্ত্রীর সঙ্গে যখন পাঁচ ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে তখন তাদের কনিষ্ঠতম ভাইটি নেহাৎ শিশু তবুও ঐ ভাইও স্ত্রীর স্বামীর অধিকার পাবে এবং শিশু বড় হয়ে যৌবনপ্রাপ্ত হলে অন্য ভাইদের মত ঐ স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ভোগ করতে থাকবে। এই বিবাহ প্রথার মূল কারণ খুঁজতে গেলে যেতে হবে খশদের আদিম যুগের জীবন যাত্রায়।

প্রথম কারণ যে যুক্ত পরিবারে শিশুর সংখ্যা তথা সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা ছিল বাঁচবার তাগিদেই একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ অর্থ যাযাবর পশুপালকের জীবন। পুরুষকে পাহাড়ের বুনিয়াদে (চারণ ক্ষেত্র বা গ্রেইজী এলাকা) পশুর দল নিয়ে দিনের পর দিন ঘরের বাইরে থাকতে হয়। বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে মাসের পর মাস পরিবারের কোন কোন পুরুষকে বাইরে আটকে পড়তে হয়। অন্য একটি কারণ পার্বত্য এলাকায় কৃষি ও বাসযোগ্য জমির অপ্রতুলতার জন্য এক পরিবারে একই স্ত্রী থাকলে পরিবার যুক্ত থাকবে, পৃথক পরিবার বা বাড়ী তৈরীর প্রয়োজন কমে যাবে। গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর জীবনের প্রয়োজনেই ব্যক্তিগত স্ত্রী না হয়ে পারিবারিক স্ত্রী প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতে দেখা যায় খশ ভারতীয় এক শাখা ক্রুদ্ধ হলেই হাতে তুলে শাবড়া এলাকা ত্যাগ করে উত্তর প্রদেশের (পাঞ্জাবে) সমতলে এসে রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। পাণ্ডবেরা তার কন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন। ক্রুদ্ধ জাতির প্রথা মত পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে নিয়ে এক স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়েছিল। সমতলে বসবাস আরম্ভ করার পর সামাজিক প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ আইনের মধ্য থেকে বহুপতি প্রথা উঠে যায় কিন্তু কিন্নর কেলা প্রভৃতি কতকগুলি এলাকায় এই প্রথা এখনও টিকে আছে। বহুপতি প্রথা খশেও সমাজের প্রয়োজনে যদি কোন নারী বিয়ের আগে বা পরে স্বামী ভিন্ন অন্যপুরুষের সাহচর্যে সন্তানবতী হয় তবে ঐ পুত্রকে রাওয়াইন সমাজের স্বামীরা আনন্দে নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করে।

কোন্ স্বামী বা অন্য কার দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়েছে সেটি একমাত্র স্ত্রী স্থির করতে পারে কিন্তু রাওয়াইনের সমাজ ব্যবস্থা পরি-

বারের বড় ভাই যে কোন ছেলেরই 'জেঠা-যোবা' বা আইনসিদ্ধ পিতা এবং অন্য ভাই-বোনেরা 'দাদেংযোবা' বা দ্বিতীয় পিতা বলে স্বীকৃত হয়।

পরদিন সকালে উঠেই দেখলাম ওদলা গ্রাম দেখতে। উচ্চতাবলয় উপত্যকার প্রাকৃতিক শোভার তুলনা নেই। উপত্যকাটির তিনদিক ঘিরে রেখেছে বাইশ মাইল দীর্ঘ এক গিরি শিরা। এই গিরি শিরার উপর অবস্থিত উচ্চতম শিখর ফুলারোহিণী (২০১৫) সম্পর্কে স্থানীয় প্রবাদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ এই পথে পাণ্ডবেরা স্বর্গে যাওয়ার শেষ করেছিলেন। উপত্যকাটির তিন দিকেই পর্বতের চূড়াগুলি চির তুষারে ঢাকা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে চলে রামধনুর সাতটি রঙের লুকোচুরি খেলা। ঐ সব তুষার মণ্ডিত গিরিচূড়া থেকে নেমে এসেছে মিরাশো, মাতাকিপাদ ও হরকিতুন নামে তিনটি উজ্জ্বল পার্বত্য ধোরা। তিনটি ধোরাই সদা নৃত্যশীল ও কলস্বনা। এরা উপত্যকার বুকে নেমে এসে তিনজনে মিশে সৃষ্টি করেছে তমসা নদীকে।

তমসার তীরবিথিকে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছোট গ্রাম ওদলা। উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ন হাজার ফুট। গ্রামটিতে ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। মেয়ে পুরুষ শিশু নিয়ে জনসংখ্যা হবে প্রায় আড়াই শ'। এখানে প্রচুর আলুর চাষ হয় কিন্তু পশুপালনই এদের প্রধান উপজীবিকা। ওলাদা ভাটমীর, গদাড়ী প্রভৃতি মোট বৃত্তিটি গ্রাম নিয়ে রাওয়াইন উপত্যকা। দূর দূর ঘরে এরা ছিল এক রকম অনাদৃত। অধুনা সাধারণ বিভাগ পূর্ত বিভাগের ও বন বিভাগের সহায়তায় যাতায়াতের কিছুটা ব্যবস্থা করেছে ও ক'রছে। উত্তর প্রদেশ সরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। করে দিয়েছে বিদ্যালয় গৃহ। বিনামূল্যে পুস্তকাদি সরবরাহের ব্যবস্থাও করেছে। এখানে ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা। সরকারী সহযোগিতা থাকলেও প্রাথমিক শ্রেণীর উপরে মেয়েদের স্কুলে যেতে দেখা যায় না। একজনকে প্রশ্ন করায় সে উত্তর দিল 'মুরীলোক স্কুলকে যাতা লেকিন বেড়কী লোক যাতা নেহি' (শিশু মেয়েরা স্কুলে যায় বালিকারা যায় না) কারণ কি প্রশ্ন করায় সে কোন উত্তর না দিলেও বোঝা গেল কারণ অর্থনৈতিক। এখানে মেয়েরা কিশোরী বয়স থেকেই পুরুষের পাশাপাশি কাজে লেগে যায়। পড়ে সময় নষ্ট করা মেয়েরা অপব্যয় মনে করে।

গ্রামের মধ্যে দেখা গেল একটি মন্দির রয়েছে, মন্দিরের কাঠের উপরে বিচিত্র ধরনের জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা আছে। মন্দি-

তন্তুজ

সকল কাজে সকল সাজে
বাংলার তাঁতের কাপড়

সুপরিমাপ, সূক্ষ্মবুনন,—রঙবেরঙ সৌন্দর্যে আধুনিকতা ও বৈচিত্র্যের সুচারু সমন্বয়

॥ প্রধান কার্যালয় ॥
৬৭, বঙ্গীবাস টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৪
দূর ভাষ : ৩৪-৫৫৫৮

॥ নগর কার্যালয় ॥
৪৪, বিপ্লবী অক্ষয়কুলচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০ ২
দূর ভাষ : ২৭-৮০১২
২৬-৬০৪৯
২৬-৮০৭৯

॥ জনতা কাপড় "তন্তুজ" বিপণীতে পাওয়া যায় ॥

বের দেবতা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীর দুর্যোধন। পুরো রাওয়াইন উপত্যকার কুড়িটা গ্রামের মধ্যে অন্য কোন দেবতার, এমন কি দুর্যোধনেরও কোন মন্দির নেই। ওদলা মন্দিরের বিগ্রহ পালা করে পর পর কুড়িটা গ্রামে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য থাকেন। যে কদিন বিগ্রহ যে গ্রামে থাকে সে কয়দিন সেই গ্রামে চলে গান বাজনা প্রভৃতি লোক উৎসব।

রাওয়াইন এলাকার শেষ প্রান্তে নৈটেয়ার যেখানে রাওয়াইন ও জৌনসার এলাকার মিশেছে সেইখানে নেবে এলে পাওয়া যাবে প্রথম অন্য দেবতা পোখু। এখানে উনি এক গ্রাম্য দেবতা। তিনি যে কোন বিপদ থেকে গ্রামকে রক্ষা করেন কিন্তু বিচারে নির্মম ও ভয়ঙ্কর। পোখু দেবতার পূজারী কোন ব্রাহ্মণ নন তিনিও একজন খস। বদলুরা মন্তব্য করেন পোখু সম্ভবতঃ পুষণের অপভ্রংশে পরিণত হয়েছে। পুষণ ঋগ্বেদের রুদ্র বা সূর্য। সম্ভবতঃ নৈটেয়ার পর্যন্ত বৈদিক পুষণ কোনমতে ঢুকেছে তার উত্তরে একমাত্র দেবতা মানুষ বীর দুর্যোধন।

ওদলার প্রচলিত কিম্বদন্তী মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ওদলা তথা রাওয়াইনের খস রাজা সদৈন্যে তৎকালীন ভারতের অধিরাজ দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেন। এদের চোখে দুর্যোধন আদর্শ রাজা ও বীরত্বের প্রতিমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা এদের চোখে আদর্শচ্যুত নীচ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। রাওয়াইনদের কথায় মহাভারতীয় যুগে দেশে যে মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত ছিল সেই আইনে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র সমস্ত রাজ্যের অধিকারী, অন্য কোন পুত্রের কোন অধিকার নেই। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন রাজা। তিনি নিজের শারীরিক অক্ষমতার জন্যে ভাই পাণ্ডুকে নিজ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। পাণ্ডু ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিয়োজিত রাজকর্মচারী মাত্র। রাজা বেঁচে থাকতেই রাজকর্মচারী পাণ্ডু মারা গেলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই নিজে ঘোষণা লোক মুখে ঐ পদে নিযুক্ত করবেন। এক্ষেত্রে পাণ্ডুপুত্র বা পাণ্ডবদের কোন দিক থেকেই কোন দাবী দাওয়া থাকতে পারে না। পাণ্ডবেরা অন্যায় দাবী করেন লোভের বশবর্তী হয়ে আর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে একটি সংঘাত বা জ্ঞাতি যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে ওরা দুর্বল হবে সেই সুযোগে নিজের পুত্র পৌত্র অর্থাৎ যদুবংশকে ভারতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করবেন।

রাওয়াইনেরা আরও মনে করে ভীম দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেন। এদের চোখে সেইজন্য দুর্যোধন আদর্শ বীর দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে ধূর্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রের মহায়তায় ধারাবাহিক ভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন এবং প্রচারের মাধ্যমে পাণ্ডবেরা ধর্মাত্মা রূপে চিত্রিত হয়েছেন।

কিন্তু উচ্চ তরলা এলাকায় প্রাকৃতিক কারণে মহাভারতের যুগের চিন্তাধারা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে তাই খশদের কাছে দুর্যোধন দেবতা এবং শ্রীকৃষ্ণ এক ষড়যন্ত্রকারী প্রতিষ্ঠাপাগী ধূর্ত মানব। এদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। ব্রাহ্মণরাও এখানে আজও অনুপ্রবেশ করতে পারে নি।

VINYLITE

KIRLOSKAR

DIESEL GENERATING SETS

A Class by itself

Available in Single/Three phase 220/440 volts

from 1 KVA to 1500 KVA with Kirloskar and Brush Alternators and Kirloskar-Dummins, Ashoke Leyland and Ruston Engines.

Satisfactory and a prompt after sales service with a smile.

Authorised DEM'S

VINEET ELECTRICAL INDUSTRIES (P) LTD.

19 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700 013

Phones : 27-6813, 27-6817, Gram : Dhingrasons.

Telex : 021-2675 (viny)

Kirloskar & Dummins way ahead in the race for Power

লাদাখ হিমালয়

অরুণ ঘোষ

বছর ঘোরে। প্রতীক্ষা যায় বাড়ে। একটা সুনির্দিষ্ট পাহাড়ী পরিক্রমার ছক বাঁধা-মত্রের মতই অঙ্কিত হয়ে থাকে হিমালয়ের অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে। অজান্তেই স্মিত-হাস্যময় অপার্থিব সুন্দর মুখটি ফোটে। সে মুখটি হিমালয়ের।

এবারের গন্তব্য লাদাখ। সুদীর্ঘ এ পথের ঠিকানা। একে একে শ্রীনগরজাম, গ্রেট হিমালয়ান, জাস্কার ও লাদাখ পিরিশ্রেণীর পরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এ দীর্ঘ পরিক্রমা। গ্লান, গ্যাপ, ছক যার বার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কত নামে আকীর্ণ এ পথের নিশানা। কেলং, বারলাচা, বারাংসা, টাংলাংলা, গে, উপশি আরো কত কি নামের সমারোহ।

লাদাখ পরতায় যেন কিছুটা অনাত্মীয় ভাব থাকে। যেমন একটা অপরিচয়ের ব্যবধান। ভৌগোলিক অবস্থান জানি তবু যেন সব জানা হয় না। কিন্তু মহান হিমালয় অবলীলায় আত্মীয়তার সূত্র গড়ে নেয়। হিমালয়ে ছুটে যেতে যেতে বিবশতা প্রাণের সত্তায় অনুভব করি। এ প্রাণ কত ভাবে, কত রূপে, কত রসে ব্যাপ্ত আকীর্ণ।

চলতি পথে হিমালয়ের তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়া গেছে। পাঠানকোট হয়ে কুলু মানালী। পাঠানকোট থেকে বাস যোগে যাত্রা করেছিলুম। অযোগে পুরো বারোঘণ্টার এ যান্ত্রিক যাত্রা। সুবিশাল, সুমহান, সমুন্নত হিমালয় উপত্যকাভূমি তার স্নেহের বাহার মা ছড়াতেই পেছন পানে ছুট। জানা গেল না, বলা গেল না, জানা গেল না। হিমালয় হয়ে যাই। মানালী পৌঁছে যাবো রাত আটটা নাগাদ। পাঠানকোটের তাপদগ্ধ আকাশ বাতাস ছাড়িয়ে চলেছে আমাদের চক্রযান। ঘুমুর ঘড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। পাহাড়চূড়ায় গোধূলি রোদ অন্ধকারের ইশারা জানায়। পাইন টীরের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার দানা বাঁধে। দিগন্তে জমাট কালো আকৃতি ফোটে। কোলে কাঁধে শীত শীত কুয়াশিকা ভর করে। অচিরেই মানালী পৌঁছে যাবো। ক্ষুদ্র উপত্যকার হপ্তোয়ার মেলা বসেছে। বছরের এই সময়টায় দুর্গাপুজোর আগে কি বছর উপত্যকা জুড়ে মেলার সমারোহ চলে। এ মেলা মিতালির মেলা, কেনাকাটার মেলা জানাচেনার মেলা। নানা বৈচিত্র্যে, নানা রূপে, নানা বর্ণে একাকার হয়ে মেলা চলে প্রায় একমাস।

আমাদের পর্যটন নির্ঘিণ্ট সময়সূচীর হাতে সঁপে দেওয়া। প্রকৃতির নিয়মে যেমন এগিয়ে চলার তাড়া। তাই এ মেলা পড়ে থাকলো আমাদের যাত্রাপথের সীমানার বাইরে। ঘুম ভাঙার পর থেকে আমাদের বাস অচিরেই মানালী পৌঁছে যাবে। আজ রাতের ঠিকানা সেখানেই। এখন যতোটা ভাবছি মানালীর কথা তার চেয়ে যেন বেশী ভাবছি বিপাশা যাত্রাপথকে। তাও পরে বৌদ্ধ জনপদ উপশি, যেখান থেকে পথ গিয়েছে বেঁকে মহাসিন্ধু পেরিয়ে হিমিসের পথে। যাযাবর বীশুর পুত পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত এই ভূমি।

ঝলমলে শৈল শহর মানালী। হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্তে রাজধানীর মতই ঐশ্বর্যময় এই শৈল শহর। আমাদের বাস তার আস্তানায় ঢুকে পড়তেই সব খানা ট্যুরিষ্টদের মোরগোল পড়ে যায়। ফুলিরা যাত্রীর অপেক্ষায়। আপাততঃ আজ রাতের আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। অগিত ও সুকুমারদা রয়েছেন সাথে।

আস্তানা পাওয়া গেছে। লাক্সিত এক-রাতের আস্তানা। তাই যেন প্রকারে গুছিয়ে নিয়ে শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ি। বিপাশা বা বিপাশার যাযাবর যাযাবরা কল কুলে এ শহরকে করেছে যৌবনবতী। পাইন-চিয়ের কোপকাত, বিপাশের শিরশির ঝির-ঝির শব্দ, বৈদ্যুতিক আলোর ঝিমঝিম। যাযাবরা স্বচ্ছ কালো আকাশ ভাল লাগছে। কিছুক্ষণের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আরাম খুব ভালো। কিন্তু কাল থেকে! আবার এগিয়ে চলেছিলুম মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের দিকে। নির্ঘন নিভুল এ পথ। বিপাশ চলে আমার ডাইনে। মন সঙ্গোপনে কাজ করে যায়। আগামী যাত্রাপথের বেদবন্ধন। আমার অবচেতায় উৎসে নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসে—ছবি আসে অনুধাবিত ভূমারাজ্যের উপত্যকায়, অনাবৃত গিরিখাদের, প্রচণ্ড ভূমার ভয়ার, পর্বতক্রোড়স্থিত হিমবাহের। মনে মনে ভয়ও থাকে, আবার যাত্রাপথে আস্তানায় হওয়ায় সাহসও চকমকিয়ে ওঠে যায় না। আর দুঃখ, দুর্ঘটনা, বেদনা? সেতো এই চলারই উপকরণ। এক কথায় পুরস্কার। শীতের সহস্র ভূমিয়ে পড়তে ব্যস্ত। কোথা একটা আবেগে আমেজটা হাঁটা ভুল। অসময়

ট্যুরিস্টের ভীড় এখন শীর্ষপ্রায়। শুধু টিম টিম তারা ভরা আকাশে আলো কালোর খেলা। কাছের তুষারাচ্ছন্ন পর্বতপ্রাকার মানালী-কণ্ঠে যেন ঝলমলে মুক্তোমালা। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। ধরে ধরে পাহাড় কৃষ্ণবর্ণ আকাশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়। মৃদু শনশনে হাওয়ায় আপেলের গন্ধ ভাসে। এ গন্ধ মানালীর নিজস্ব। রাত বাড়ে। বৃক্ষ-তরুর ভিতর দিয়ে আবছায়া অন্ধকার, দূরের দুই একটা জন্তুজানোয়ারের হাতছানি। কোথাও হেমন্তময় শুষ্কতায় বৃদ্ধ গাছ লতাপাতা মেখে দিয়ে বাঁধা, কোথাও শুধু অন্ধকার-ছায়া-কুয়াসায় লুকোচুরি।

আগামীকাল ভোর চারটেয় বাসস্টেণ্ডে আসা চাই। দিনমানে একটিই বাস যাবে উদয়পুর। পথে ত্রিলোকনাথ দর্শন। রোহ্তাং হয়ে খোকসার তাণ্ডী পেরিয়ে আমরা যাবো পশ্চিমমুখী চন্দ্রভাগাকে বাঁয়ে রেখে উদয়পুর পর্যন্ত। পথ সেখানে শেষ। এর পরও পথ আছে। সে পথ দুর্গম। পায়ে চলার পথ। হিমাচল কর্তৃপক্ষ গাড়ী চলা পথের তরীপ চালাচ্ছেন। অচিরেই এ পথ পাকী উপত্যকা হয়ে ফল্গু পৌঁছে দেবে যাত্রীদের। হিমাচল সরকারকে মনে মনে তারিফ করি। লাহল, স্পিতি, লাদাখের দুর্গম গিরিকান্তারে যেন ভাল রাস্তার জাল বিস্তার করেছেন। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধনুকীর মত রাস্তায় সেতুবন্ধ রচনা করে আমাদের দেশে দেশে ঠাঁই করে দিয়েছেন। সভ্যতার বিস্তার, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসেও ঘুরে থাকা, পেছিয়ে পড়া সুদূর পাহাড়ী লোকেদের কর্মচাঞ্চল্য বাড়ে, দেশ এগিয়ে চলে, একজাতি একপ্রাণ সক্ষ্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

উষার অস্ফুট আলো ফুটতে না ফুটতেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়েছি বাস ষ্টেণ্ডের উদ্দেশে। দিনমানে একটাই বাস। শিরশিরে জমাট শীত। এরই মধ্যে বাসষ্টেণ্ডে পুরু যাত্রীর জটলা জমেছে। টুপীর আলোয় চায়ের দোকানী পরম নিষ্ঠায় চা বানিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে কিছু লাদাখী যাত্রী চোখে পড়ে। সংখ্যায় নগণ্য নয়। কম্বলের আলখাল্লায় ভূষিত লাদাখী যাত্রী যেন একেক-জন চলমান শয্যা বয়ে চলে। কুলুর মেলা দেখে ফিরে চলেছে আপন গাঁয়ে। জিজ্ঞাসা করে জানি ওরা যাবে বারলাচা ছাড়িয়ে (১৬০৪৭) যারচেলার পাদদেশ পর্যন্ত (১৭০০০)। ওদের সঙ্গে যেমন একটা আত্মীয়তা বোধ করতে থাকি। আমার যাত্রা-পথের দীর্ঘ বিবরণ ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাই। জানা যেটুকু হয় সে না জানারই সামিল। পথের হদিশ স্পষ্ট কিছু মেলে না। আপাতত ওরা যাবে ত্রিলোকনাথ। ত্রিলোক-নাথ ওদের পরম তীর্থযাত্রা। কথায় কথায় জানি মাথারলার পাদদেশে হিমালয় গহনে পাঁচ ছয় ঘর নিয়ে ওদের ক্ষুদ্র গ্রাম। সভ্যতা এড়িয়ে প্রকৃতির খেয়ালে সমর্পিত কিছু প্রাণের সাড়া জাগানো ঐ গ্রাম। যেন ইচ্ছা নির্বাসন। চা খেতে খেতে কথা বলতে বলতে উদয়পুরের বাস চলে আসে। ত্রস্ত হাত ছুটো-ছুটি চলে কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে মানালীর চতুর্দিকের পাহাড় চূড়ায় সোনালী আলো ঠিকরে পড়ে। আমরা কোন প্রকারে বাসে উঠে পড়ি। কুলুর মেলার দাপটে এ সময়টা এ পথে ভীড় এড়ানো দায়। যাদের আস্তানায় পুলকিত আমরা। বাস চলতে শুরু করে। ডাইনে বাঁয়ে চলমান পুরু পুরু বন বনান্তর। সুন্দর মাটির গন্ধ। কত পাইন, চিড়, ফার গাছের ফাঁকে ফাঁকে নাম না জানা আকাশ-ছোঁয়া বৃক্ষের ভিড়। বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রছায়া। আমরা মানালী ছাড়িয়ে রোহ্তাংএর পথে চলেছি। রোহ্তাং পেরিয়ে লাহলের সীমানায় ঢুকবো। মানালী থেকে লাহলের পথ দুটি। প্রথমটি রোহ্তাং ও দ্বিতীয়টি হাদতা (৪০২৭) গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে। তবে লাহলের অন্তরতম প্রদেশ পদ্ম রোহ্তাং। চলতে চলতে বুঝতে পারছি ধরণীর ছাড়িয়ে ফল্গুতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বন বনান্তর শীর্ণপ্রায় হয়ে আসে। রুক্ষ করাল গ্রীবা নিয়ে শৈল সমাকীর্ণ পর্বত প্রাকার সমুখ ছাড়িয়ে দূরান্তরায় মেশে। কুলু ও লাহলের প্রাকৃতিক কৃপ্রকৃতি নিদারুণভাবে বিপরীত-ধর্মী। সমুখে মেরুপ্রান্তর ছোঁয় লাগে। যেন যৌবন থেকে একলহমায় বার্ধক্যে সংক্রান্ত করতে যাচ্ছি। চঞ্চলতা থেকে মৌনে। উচ্ছলতা থেকে স্থৈর্যে।

বোধকরি খোকসার এসে পৌঁছেছিলুম দুপুর নাগাদ। খোকসারের চেহারা বড়ই বিকট। প্রকৃতি যেন ধর্ষণ উঁচিয়ে। কেমন একটা ধূসর ধূ-ধূ বিষণ্ণ তন্ময়তা এর চোখে মুখে। এখানে যেন কিছু লাহলী ও লাদাখী লোকজন। কেউ বাসের অপেক্ষায় কেউ বা রাস্তার কাজে ব্যস্ত চলাফেরা। তবুও যেন ভয়ঙ্কর নির্জন এ উপত্যকা। খোকসার থেকে তাণ্ডী হয়ে আমরা যাবো উত্তর পশ্চিমে চলে যাবো উদয়পুর। আমাদের ডাইনে পড়ে রইল কেলং। জেলাসদরের সহর কেলং। স্রোতস্বিনী চন্দ্রা ও ভাগার মিলিত সলিলধারা যাত্রিধারাতেই লাহলের প্রাণ সঞ্চার। চন্দ্র-হারের মতই চন্দ্র ও ভাগা লাহলকে ঘেরে করে আছে। বারলাচা গিরিসঙ্কট এই দুটি স্রোত-স্বিনীর উৎসস্থল। বারলাচা সঙ্কটের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের তুষার হিমবাহ থেকে চন্দ্রার ধারা। বুনবুন গিরিশ্রেণীর মধ্যউপত্যকায় পালামো গিরিবর্ত্মের কাছে সৃষ্টি করেছে চন্দ্রতাল। এখানেই চন্দ্রা তার চঞ্চলাপ্রবাহকে শুরু করেনি। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুঁসে নেচে কলরব করে বেরিয়ে এসেছে বুনবুন গিরিবর্ত্মের পাদদেশে। এক-বার দক্ষিণে তারপর গতি পালটে দক্ষিণপূর্ব প্রবাহিনী হয়ে হাদতা গিরিবর্ত্মের পাদদেশ পেরিয়ে খোকসার হয়ে তাণ্ডীতে এসে মিলেছে

তাসার। হয়েছে চন্দ্রভাগা। চন্দ্রা ও ভাগা এ দুটি নদীর মিথুনাকৃতি মধ্যাকর্ষণই লায়ন হিমালয়ের কেন্দ্রীয় কৃতাস। আমার বায়নাচা গিরিসঙ্কটের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে দীর্ঘ স্রোতস্বিনী ভাগা উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে জিঙ্কিংবার জনপদের পাশ কাটিয়ে বাঁক নিয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমে। তাদার কূলবর্তী-উপত্যকা কৃতাস অপেক্ষাকৃত উর্বর ও সমৃদ্ধ। সহর উপত্যকা জুড়ে কৃষিক্ষেত্র ও সুদীর্ঘ বনভূমি। স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে শুনেছি এখানে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন খুব ভাল। জব এবং আলু এখানকার প্রধান কৃষিজাত পণ্য। তাদার প্রবাহপথের সবচেয়ে সুন্দর তাবল অংশ হচ্ছে জিনপা থেকে কেলং পর্যন্ত। তাদীতে এসে চন্দ্রা ও ভাগা দুটি সত্তার সঙ্গম। প্রাণে প্রাণে দেহে দেহে মনে মনে আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা। চন্দ্রভাগা এখন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর। মিলনের প্রশস্তি এনেছে নদীর অবয়বে। কলেবর বেড়েছে স্ফীত। কূলপ্লাবিনী ধারা এখন শান্ত সমাহিত। সহসা যেন ব্যস্ততা হারিয়েছে। তাদীর পর থেকে প্রায় ষোল মাইল পথ প্রবাহিত হয়ে খিরোটের কাছে চন্দ্রভাগা চাষার প্রবেশ করেছে।

একে একে খোকসার হয়ে তাদী পেরিয়ে আমাদের বাস চলেছে এঁকেবেঁকে। চলার গতিতেই মানুষ হচ্ছে হারা স্থবিরের নয়। পথরোধে যানযান বিপত্তোরে এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়ের পা কেটে পথ অনন্ত গিরিশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। দিনযানে পদ্মবো পৌঁছোবো এই আশা। কিন্তু বাদ সাধলো আমাদের চক্রযানটি। অপরাহ্নের স্নিগ্ধযান আলো তখনো পর্বতশীর্ষে সোনালী রোদের শেষ আভা ছড়াচ্ছিল। অকস্মাৎ তীব্র কাঁকুনি খেয়ে এবং বিকট আওয়াজ তুলে আমাদের বাহনটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তড়িঘড়ি নেমে পড়েছিলুম। তৎক্ষণে ড্রাইভার লাফের গাড়ীর নীচে ঢুকে পড়েছে। আশপাশে লোকালয় আছে এমন বোধ হচ্ছে না এবারই এক ছোটানা ভাবনা নিয়ে সাথী এক লাদাখী যাত্রীকে প্রশ্ন করেছিলুম, গাড়ী আবার চলবে এমন বোধ হচ্ছে না—এখন কি করা যায়? শহরে নিরাপত্তাবোধ বোধকরি আমাদের কিছুটা চঞ্চল করেছিল। সাথী লাদাখী যুবা একটু হেসে অভয়দান করেছিল। বলেছিল অদূরে তালদা গ্রাম। প্রয়োজন হলে আজ রাত্তিরের আস্তানা পেয়ে যাবে। যা ভেবেছিলুম তাই হল। ড্রাইভার গাড়ী পরীক্ষা করে এই ঠিক করেছে যে রাতের অন্ধকারে এ গাড়ী এক কদমও এগোবে না। মিন্নক হেডলাইটের আলোয় এ বন্ধুর পথে এত যাত্রীর প্রাণের ঝুঁকি সে নিতে চায় না। আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ড্রাইভারকে অন্ততঃ কালদা গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আরজি পেশ করতেই ড্রাইভার রাজী। কিন্তু সহযাত্রী লাদাখী ছেলে

★ আপনি কি তফসিলি জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ?

★ আপনার পারিবারিক বাৎসরিক আয় কি ৩৫০০·০০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে) বা ৪০০০·০০ টাকার (শহরাঞ্চলে) কম ?

★ আপনি কি কোন লাভজনক উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহী ?

★ আপনি কি শিক্ষিত বেকার ?

★ আপনি কি কৃষি, পশুপালন, রেশমচাষ, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে আগ্রহী ?

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও অর্থ কর্পোরেশন, ১৫৪-এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, সেকেণ্ড ফ্লোর, কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা জেলা শাসক/জেলা তফসিলি ও আদিবাসী মঙ্গল আধিকারিক।

পশ্চিমবঙ্গ তফসিল জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও অর্থ কর্পোরেশন

যৌ, যুবা, বৃদ্ধা একে একে হৈ হৈ করে নেমে পড়ল। চক্রযানটির দোলায়মান গতি এদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। আমাদের বাহনটির জলদগতায় এদের সন্দেহ জেগেছে। এরা প্রকৃতির ভ্রূকুটি সহ্য করে কিন্তু যন্ত্রের নির্ভরতায় নিরাপত্তা বোধ করে না। তাই দেখলুম ওরা আমাদের যানটিকে শুধু বর্জনই করল না, ওরা সহসা সতর্ক পথে সকল বলে ত্রিলোকনাথের পথে অগ্রসর হতে থাকলো। আমি অবাক মানি। এ পার্বত্যলোকে ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি অদ্ভুত জীবনচর্চার কথা। আমার চোখের সম্মুখে এ দুর্গম অরণ্যলোকে দরিদ্র বল্পবাক সরল মানুষের জীবনগাথা সবিস্ময়ে ব্যক্ত হয়। এ শৈলারণ্যে নিদারুণ স্বাচ্ছন্দ্যহীনতার মধ্যে পাহাড়ী জনসাধারণ কেমন করে দিন কাটায় এ প্রশ্নের জবাব যেন অবলীলায় খুঁজে পাই এদের এই অলোকসামান্য আচরণের মধ্যে। আমার শরীর চিন্তা চিত্ত খায়। ঠিক রোমাঞ্চ হয় না। অথচ ওরা হাসে, খেলে, নাচে, উৎসব উদ্‌যাপন করে এবং সংবৎসর ত্রিলোকনাথের পথে পথে ঘুরে যায়। আমি ওদের প্রতিটি শিশু বৃদ্ধ, যুবককে দেখে বিস্ময় বোধ করি। মনে মনে ওদের প্রতি সম্ভ্রম জাগে। দীর্ঘকাল পর্বতারণ্যে থাকতে থাকতে ওদের ভেতর এক ধরনের শান্ত গভীরতা এসেছে। জীবনের তুচ্ছতা বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। শহরের উপকরণ-সর্বস্ব লোভী জীবন এদের এখনো স্পর্শ করে নি। যাদের যাত্রী হিসেবে এদের কোন অনুযোগ নেই। নেই কোন অভিযোগ। মাসুল আমাদের চেয়ে ? সে ওদের অজ্ঞাত। পাওয়ানার হিসেব এদের জানা নেই। অবলীলায় হেঁটে চলে আপন সন্তব্য পথে।

অন্তত্তায় গিরিপ্রদেশে যানের অভ্যন্তরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলুম। করার কিছু নেই। অদূরে বহু নীচে চক্রযানটা পাহাড় গায়ে আছাড় খেয়ে শব্দের কল্লোল তুলে ধেয়ে চলেছে। হিমগিরির কঠিন কালো অবয়ব যেন শুভ্রতায় পাহারাওয়ালা। নিথর দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। এ শুভ্রতায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে থাকি। এই নির্জন তপলোক আমার স্মৃতিকে যাদুমন্ত্র করে বর্তমান থেকে অতীতে প্রসারিত হয়। ভাবি ভারতের সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে, গহন গিরিকান্তারে। সেই অরণ্য-বাসনিসৃত সভ্যতার ধারা এখনো অমলীন হয়ে আছে ভারতীয় জীবনধারায়। উত্তুঙ্গ কঠিন পাহাড় তাকে করেছে অন্তর্মুখী। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই সভ্যতার দ্বারা তাপসী তারা নির্জনবাসী, বিরলবসন তপস্বী। মহাভারতীয় যুগের কুশীলবগণ বারবার হিমালয়ে বিচরণ করেছেন। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ঋষিদের সাধনক্ষেত্র এই হিমালয়। মনে পড়ে শঙ্করাচার্যের তপঃপূত যোশীমঠ, ওঙ্কারাদিদের তপস্যাক্ষেত্র হেমকুণ্ডের কথা। মনে পড়ে তিব্বতী সাধক কবি মিলারেপার কথা। এই বনবাসী অতীত তপস্বীদের আমরা আমাদের আদি পুরুষ বলে জেনে এসেছি। রামায়ণে রামকে দেখেছি, তারা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন, পর্ণকুটীরে বাস করেছেন। কোন ক্লেশ বোধ করেন নি। এই সমস্ত নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে এদের হৃদয়ের মিলন ছিল। এখানে তারা গতবাসী নন। গিরিবনশ্রিয় রাম দীর্ঘকাল চিত্রকূট পর্বতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূট শীর্ষ দেখিয়ে বলেছেন—"সুহৃদগণের কাছ থেকে দূরে বাস করেও আমার আর দুঃখ হচ্ছে না।"

আমাদের চক্রযানটি তখনো বরফের মতো জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ নিদারুণ নির্জনতায় কেমন একটা সম্বিহীন হয়েছিলুম হঠাৎই যন্ত্রযানচালক কথায় নির্জনতা ভাঙে। আমি সচকিত হই। তিনি বলে চলেন রোতাং-এর কথা। তখনো রোতাং পেরিয়ে লাদাখে চোকার রাস্তা হয় নি। হাঁটাপথে তিনি ত্রিলোকনাথ দর্শন করে গেছেন। এখন কত সহজেই না আমরা ত্রিলোকনাথ চলেছি। আমি যদি এই সহজযাত্রার মূল্য দিচ্ছি আমাদের বর্তমান ঘরিয়তায়। তেবেছিলুম সময়কে তুচ্ছ মেরে এক লহমায় ত্রিলোকনাথ দর্শন করে আমাদের মূলপথের নিশানায় বেরিয়ে পড়া যাবে। এখন যন্ত্রের তরলা ছাড়া গতি নেই। ড্রাইভার সাহেবের করুণায় তরলা রেখে অপেক্ষা করি। ঘটি ঘটি সময় গড়িয়ে যায়। আমি ভাবি কেমন করে কয়েক শত বর্ষ আগে ১৬৭১ খ্রীঃ জেসুইট মিশনারীরা তিব্বত থেকে পায়ে হেঁটে লাদাখের মধ্য দিয়ে তাংলাংলা, মারাংলা, বারলাচা গিরিসঙ্কট পেরিয়ে রোতাংএর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার পর রোতাং পেরিয়ে কুলু। এরপর উইলিয়াম মুরক্রাফট সম্ভবত: ১৮১৯ খ্রীঃ রোতাং পেরিয়ে বারলাচা সঙ্কট হয়ে লাদাখ অতিক্রম করেছিলেন। তাদের একে একে পীরপাঞ্জাল, গ্রেট হিমালয়ান লাদাখ ও জাস্কার গিরিশ্রেণী পেরিয়ে আপন সম্ভব্য তুর্কীস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। আমি এ কাহিনী শুনে এই দুর্গম সাহেবদের মনে মনে প্রণাম জানাই। আমি ভাবতে থাকি আমার অকিঞ্চিৎকর হিসেবী চলার কথা। ঘুরে ঘুরে কেবল কূলের মধ্যেই চলি। এ চলায় কিন্তু এসোয় না। যে চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, যে চলা আবেগে আকুল সে চলায় জগৎ এগিয়ে চলে। আমি ঐ অকুতোভয় সাহেবদের ধৈর্য তিতিক্ষা ও দুঃসাহসিকতার তুলনা খুঁজে পাই না। তুর্কীস্থান থেকে ভারতে ফেরার পথে মুরক্রাফট অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি অনাবিষ্কৃত পশ্চিম হিমালয়ের পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। আজকে আমি কত হিসেবী পদক্ষেপে বাঁধা নিয়মের গণ্ডী মেনে চলেছি এ পথে, তাই বোধ করি আমার পদে পদে বিপদ দেখা দিচ্ছে।

যাত্রীহীন বাস এখন চলছে একটা পাথর থাকের মাঝখানে দিয়ে চড়াই বাস চলছে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে সেপ্টেম্বরের ঠাণ্ডা একটা বৈদ্যুতিক আলো মতন পড়ে আছে। আমরা পৌঁছোতে সময় লাগে বড়। এখানে আলো পৌঁছোয় পালা। ছোট্ট ঘরে মানুষ পৌঁছোয় আস্তে ছোট্ট। এই ঘরেই একবারের জন্য বাসাবোধা করে নিতে হবে, তাই সোনালির বুড়ো শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে সবাক-শব্দ বন্ধ করা হল। যার কাছে ছাইচাপা বলে কিছুই ছিল না ঘর ছোট্ট বাস চালাবে এর আগেপরে প্রশ্ন হয়ে দিয়েছিলুম। উপরের ঘরে পৌঁছলুম তখন বেলা আটটা। সবকটি বাসের পাওয়া গেল না। তিন চারজন করে ভাগে কম বেশি একটা বাসের পাওয়া গেছে। সঙ্গে মালপত্র বেশিরভাগ আমাদের সঙ্গের পাশের চালকদের। মালপত্র থেকে তোলবার করে ত্রিলোকনাথের পথে রেখে পড়তে হবে। সময় নষ্ট না করে কারুর কেউ পৌঁছে যেতে চাই। কারণ আগুনের পাঁচ কয়েক মাইলের মধ্যে উপরাকার মতিরেই দুধারে অবগুণ্ঠন ছেয়ে ফেলে। তার চারদের ঘোড়া বিশাল কঞ্চিন। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডাপ্রবাহ থাকবে বেশ। তাই বেরোন পর্যন্ত একটা কিছুটা সাবধানী। ত্রিলোকনাথ এখান থেকে মাত্র ১৩ কিঃ মিঃ চড়চড়াবে পায়ে পায়ে আমাদের যাত্রার আরোহন। কম পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলে-ছিলুম। আমরা যে পথে এসেছিলুম, সে পথেই অনেকটা নিচে গিয়ে সেতু পেরিয়ে নদীর অপর পারে চলে যাবো। শিলাখণ্ডের যাত্রে যাত্রে ঘেঁষে মাটির পথ সেখানেই পড়-ছে। পথে উপরাকার ছুতে আসু আসু ও বাদির চাষ। ঠাণ্ডার যাবারে একবার আবার ঐ আসু আবার। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের যাত্র প্রধানতম খাদ্য কটি ও আসু ছাড়া কিছু নেই। পাহাড়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র ত্রিলোক-নাথের মন্দির দৃষ্টির সীমানায় ধরা পড়ে। অন্যথা দ্বিমতী পতাকায় বেতাজালে ঘেরিয়ে ত্রিলোকনাথের মন্দির চন্দ্রচাপার ফুলে সমস্ত লয়ন হিমালয়ের যাত্রী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্লেশে যাত্রার, ক্লেশেরেশে, বুড়ো আসু ভুলে চলে। ওদের কথা, হাসি, গান, আনে তাদের। নির্জনতায় ঈশ্বর সঙ্গন ভাল লাগে। এক-ঘেয়ে লোকালয়হীন পথচলায় ক্লান্তি আনে মনে।

মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই আমরা দাঁড়িয়েছিলেন মন্দিরের যৌথ পুরোহিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর দর্শন করি। অদ্ভুত সুন্দর মূর্তি। একইকালে তিনি অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ ও শিব। তাই দলে দলে বৌদ্ধ ও হিন্দু তীর্থযাত্রী পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত এ মন্দির দর্শন করে কৃতার্থ হয়। অভ্যন্তর মন্দির প্রকোষ্ঠে পাশ, সোনা

সমাহিত মূর্তি দর্শনে তখন মুগ্ধ হয়েছিল। পরম নিষ্ঠায় মাথের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলুম। যাত্রাথী তীর্থযাত্রীদের অনুকরণে মন্দির গাত্রোত্থিত ঘর্ঘচক্র ঘোরাতে ঘোরাতে মন্দির প্রদক্ষিণ করে প্রণাম দিলেছিল পাহাড়ী নিষ্ঠাই।

পুরোহিতকে আমাদের উৎকণ্ঠের কথা জানাতে তিনি আমাদের হাতে রক্তবর্ণ আশীর্বাদী ডুমরো ঘর হাতে দিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের যাত্রা শুভ ও নিরাপদ হোক।" ত্রিলোকনাথের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন গতবছরের দুর্ঘটনার কথা। পর্বতকোলচ্যুত হিমবাহ মন্দির সংলগ্ন সমগ্র গ্রাম ধ্বংস করে তাহার পরে চন্দ্রভাগায় নিমজ্জিত হয়েছিল অথচ মন্দির স্পর্শ করেনি। অবিনশ্বর ত্রিলোকনাথ মৃত্যি-শাল বংশের মধ্যে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি তাবি মৃত্যুর মৃত্যুর নটরাজের লীলাখেলা। সৃজনে যেমন বিশ্বহস্ত সংহারেও তার ত্রুটি নেই। বরফঠোরা হাওয়ায় কাঁপন লাগে। সূর্যদেব পাহাড় আড়ালে লুকিয়ে পড়তে ব্যস্ত। ছাটি ছাটি ছায়া ঘন হয়ে আসে। আমরা ফিরে যাবো উদয়পুর। মন্দিরের পূজারী সঙ্গী হয়ে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে যান। চলতে চলতে তিনি বলে চলেন ত্রিলোকনাথের কথা, এ মন্দিরের কথা। চতুর্দশ শতাব্দীতে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। প্রয়োজনে দর্শনার্থীদের রাত্রি-বাসে স্থানাভাব হয় না। বৎসরান্তের এই সময়টা নির্জন গিরিবনবাসী দরিদ্র গ্রামীণ মুটিয়ের পাহাড়ী জনসাধারণের জীবনে ক্ষণ-কাল আনন্দস্রোত বয়ে যায়। বিশ্বভোলা প্রকৃতির লীলাখেলায় যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোন বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানব-চিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারত-বর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনে এসেছে। তাই ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের পর্বতআশ্রিত নদীগুলি অক্ষয়-ধারায় সঞ্জিবনী রসদান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। আমাদের হরিদ্বার পবিত্র, হৃষিকেশ পবিত্র, কেদারনাথ পবিত্র, বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, নর্মদাসঙ্গম পবিত্র এবং সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবদান পবিত্র।

নির্জন পাহাড়ের গা বেয়ে, হাত কাঁপানো শীতের পরশ গায়ে মেখে গোধূলি আলো মিলিয়ে না যেতেই ফিরে এসেছিলুম উদয়পুর। উদয়পুরের অপর দ্রষ্টব্য হিমালয় কন্যা পার্বতী-দেবীর মন্দির। মুগ্ধ্যম কারুকার্যের ঐশ্বর্য নিয়ে নিভৃত ছোট মন্দির দর্শন করে তৃপ্ত হয়েছিলুম। ফিরে আসছিলুম ইন্দ্রবসতির আশ্রয়ে। অন্ধকার পথ, আকাশে অসংখ্য তারার ভিড়। রাস্তার কাছে নিয়োজিত কিছু স্থানীয় শ্রমিক চায়ের দোকান ঘিরে ঘুরঘুর করে। ওদের কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই যানাদী থেকে বাস আসবে এবং এই বাসই কাল সকাল ৮টায় কেলং ফিরে যাবে। আমরা কাল এ বাসেই যাত্রী।

একটা উচাটন মন নিয়ে নিশ্চেতে ঘিনিং ব্যাগে চালান করেছিলুম। রাত বুঝি শেষ হয়ে এলো তখনো পৌঁছয়নি। আকাশের উজ্জ্বল তারারা চন্দ্রভাগার কালো জলে চাদা ফেলে টলটল করে। শীতে কাঁপা বিছানার মায়া-পাশ নিয়ে আসা যাওয়া করেছিলুম কতবার। ভোরের আলো স্পষ্ট হতে বাস ছাড়লো। আমাদের যাওয়া হল না। শুধু চাই ছিল না আমাদের।

সড়ক বিভাগের কর্মীদের কাছে খবর নিয়ে জেনেছিলুম রাস্তার কাজে নিয়োজিত একটি ট্রাক ভাণ্ডী পর্যন্ত যাবে। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষায় থাকলুম। বাটাতরে পান খেয়ার মত ড্রাইভারের হাতে তুলে টাকা দিয়েছিলুম। ড্রাইভার কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে কিছুটা চালকীয় ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ভাণ্ডী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর ভাণ্ডী থেকে কেলং। সেদিন ছিল রবিবার। ছোট্ট শালকের অফিস বন্ধ। মুক্ত এ তুষারশীতের হাপটে মুহ্যমান। এ অবেলায় রাত্রিবাসের আশ্রয় খুঁজে পেতে বিলম্ব হল বটে তবে আশ্রয়টি ভাল পেয়ে গেলুম। সন্ধ্যের দিকে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাদের এ পথ পরিক্রমায় জেলাশাসকের অনুমতি পত্রের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে পরামর্শও চলেছিল বেশ কিছুদিন। শালীয় জানালায় চোখ রেখে দেখেছিলুম বিশাল ছোড়া শিলারাশির তরঙ্গভঙ্গ। নাকের ওপর শ্বেতশুভ্র পর্বতচূড়া মাথের মত কথা তুলে কেলং তুষারকে আচ্ছাদন করে রাখে। দূরে ভাগার তুষারকলোচ্ছ্বাস চন্দ্রার কূলে ঝেরে চলে। সহজ উপহারে ভুলে আসুর চাদ। বন্ধুবর্গ আসু রাস্তার পাশে পড়ে থাকে পরিবহন অপেক্ষায়। রোদ্দুর পেরিয়ে উদয়পুর পর্বত পর্বতের পাশ দেখে কথা নয় ঠিক দেখে-ছিলুম। কেলং উপত্যকা যেন ছোট্ট বেসামরিক নয়। এর গায়ে গায়ে পাশে পাশে সোনালী সবুজ ওলনা ওড়ে। চোখ ধাঁধাঁয়, আবার নয়ন জুড়োনো তুষির হাতছানিও থাকে। পাইন পপলার আর উইলো এক পাহাড়ের দেশে এক অত্যাশ্চর্য মূর্তিমান বৈচিত্র্য। যেন আমি প্রাণ, তুমি প্রজ্ঞা। আমি রং, রস, রূপ, তুমি শ্বেতশুভ্র পূর্ণতা।

জেলাশাসকের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলুম সন্ধ্যা নামার আগেই। পাকদণ্ডী হয়ে অনেকটা পথ নেমে জেলা শাসকের বাংলো। তিনি গৃহের অন্তঃপুরে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে স্বাগত জানিয়ে বসতে বললেন। আমাদের কথা শুনে তিনি বলে-

ছিলেন আমাদের কোন অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হবে না। সেই হিসেবে সীমান্তরক্ষীদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। তবে তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "আপনারা একটু বেশী দেরী করে ফেলেছেন। প্রতি পদে বুঁকি থাকলো সঙ্গী হয়ে। তুষারপাত ঘটলে আটকে পড়ার সম্ভাবনা।" সেপ্টেম্বর থেকে এ ধরণের আড়াআড়ির মধ্যে প্রোথিত হয়ে থাকবে সুদীর্ঘ ছ'মাস কাল। মধ্যপথে আটকে পড়লে জীবন বিপন্ন হবে। জেলাশাসকের কথা শুনে রওনা হয়ে এসেছিলুম নিজ আস্তরে। ভাবছিলুম শীতের প্রবাহ এখনো ঘিরিয়ে বসেনি। তবু কি জানি হিমালয়ের প্রকৃতি বড়ই হটকারী খেয়ালী। কখন যে ভ্রুকুটি করবে কে জানে। প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে দোদুল্যমান ছিলুম কিছুক্ষণ। আলোচনায় ঠিক হল আমাদের যাত্রার গতি অব্যাহত থাকবে। নিয়মমাফিক তুষারপাতের সময় এখনো পনের দিন বাকী। জেলাধিপের জিম্মেবাবের নাম করে আশ্বস্ত হওয়াই যাক না।

কাল প্রত্যুষে ধারচা পর্যন্ত চলে যাবো। নিয়মিত যাত্রীবাহী সড়কপথ এখানেই শেষ। এখান থেকেই মালবাহী ঘোড়া ও গাইডের আয়োজন করতে হবে। এ শীতের বরফঝড়, ঘোড়া ও ভূটিয়াদের বিশ্রামের কাল, কার্যহীনতার কাল। একটু বেশী পয়সা কবুল করেও ওদের পেলে আমাদের কৃতকার্যতার আশা জাগিয়ে রাখা যায়। জেলাঅফিসের এ গৃহকোণে বসে ভাবছিলুম আমাদের যাত্রাপথ সুনিশ্চিত হয়েও এখনো অনিশ্চয়তার মেঘে ভারাক্রান্ত। মন এখন পক্ষীরাজ ইচ্ছার সোয়ারী হয়ে ধারচা, বারলাচা, জিলপার আনাচে কানাচে আমাদের উপ্সিত অশ্বখুরের শব্দ শুনতে চায়।

ধারচায় যখন পৌঁছেছিলুম তখন সকাল নয়টা। লোকালয়ের শেষ সীমান্তপ্রহরী জমা দুই সিপাই। এদের কথা জেলা শাসকের কাছেই শুনেছিলুম। ঘোড়াওয়ালাদের খবর করেছিলুম ওদের কাছেই। ওরা পরম অতিনিবেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। আমাদের গন্তব্য ওদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। কিছুটা যেন হতাশবস্ত। ওদের চোখে উপ্সিত কুলি ও মালবাহী ঘোড়া সবই পেয়েছিলুম। ওরা আমাদের নির্দিষ্ট পথে বরফের আস্তরণ তারী না হতেই একটু শীঘ্রই উপসি পৌঁছে দিতে চায়। আমাদের পাহাড়ে হাঁটার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চায়। আমাদের কথা শুনে ওদের সন্দেহ জাগে। ওদের বিস্ময় দৃষ্টিতে যেন একটা অস্বীকার লক্ষ্য করি।

বিপুল একটা দূরত্ব প্রস্তরময়তার মধ্য দিয়ে চলেছিলুম। বর্ণাঢ্যলোকের মতই তীক্ষ্ণ পর্বতচূড়াগুলো যেন বিবিধ প্রশ্ন নিয়ে

কৃষি শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতির
বাস্তবায়ন কল্যাণকামী প্রকল্পের দ্বারা
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য
তিন বছর প্রয়োজনের তুলনায়
কম হলেও
শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে
বামফ্রন্ট সরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে।

ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ
এই লক্ষ্যে পৌঁছতে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।
এখন এই অগ্রগতির জন্য
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন
জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে
শান্তি মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষার
সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার—ত্রিপুরা সরকার

আমাদের মাথের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাড়ে কাঁপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেটের ভেতর সেঁধিয়ে দিয়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে বসেছিলুম। এমন একটা সীমানাহারা ক্যানভাসে সাদায় মাখামাখি বসে থেকে আগামী পথের মনোরম বিবরণ বড়ই বিস্বাদ ঠেকছিল। এ যেন এক পূর্বাপর জড়জগতের ইশারা। কেমন একটা ঘোরলাগা অবস্থায় বারলাচা সঙ্কট পেরিয়ে এসেছিলুম। গ্রেট হিমালয়ান ও আদার সিরিজেরীর অন্তর্লোকে বারলাচা, মারাংলা, বাংলাংলা শিরিবর্ত্ত লির কালজয়ী অস্তিত্ব ও অবস্থান ভারতীয় ও তিব্বতীয়ের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথ-নির্দেশক হিসেবে ইতিহাসের উষাকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভাবছিলুম এ দুর্গম গিরিবর্ত্তগুলি বৎসরান্তের কোন এক সময় হয়তো সচকিত, উৎকর্ণ হয়ে থাকতো কিন্তু চলমান সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক জীবন-স্রোতকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে অনুভব করতে। বারলাচা (১৬০৪৭') পেরিয়ে মারাংলার পথ ধরেছিলুম (১৭৪০০')। চলার পদ্ধতির মধ্যে যেমন অবিবেচনার বেগও হরকার, বিবেচনার সংযমও অবশ্যক। তাই অবিরাম পথ চলার সংগ্রাম চলেছিল। পাছে ডুবার ভয় কিংবা সুবিপাল ধরা আমাদের পথ রুদ্ধ না করে। কুটিল গতিপথ। কখনো দ্রুত, কখনো ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। আমাদের সহযাত্রী মালবাহী ঘোড়াওয়ালার এই আদেশ। ওর অভিজ্ঞতা আমাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। এ পথে হাত ধরলে আমাদের বিশ্বাস নেবারও জায়গা মিলবে না। চরমে ভয় ভয় রোমাঞ্চ খেলা করে। প্রতি পদক্ষেপ হিসেব করে ফেলি। তাইনে বাঁয়ে নিঃসীম শূন্য। কখনো ধস নামা প্রস্তরস্তূপ আমাদের অবিরাম অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। হিমালয়ের গহন গভীরে অনির্বার কি নিদারুণ ভালবাসার খেলা! কূলহীন অনন্ত বরফপাহাড়ের মধ্য দিয়ে বরফ ঢাকা পথে। পথ চলেছি ছাউনি ফেলেছি, প্রকৃতির অকৃপণ এক্তিয়ে কঠিন গিরিবর্ত্ত ভালোভালোকেও পেরিয়ে গেছি রাত্রি শেষের ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। যোজনব্যাপী খোপে খোপে, গায়ে গায়ে, উন্নত পর্বতের সারি। অগণন পর্বতচূড়া সমগ্র প্রদেশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সমগ্র পশ্চিম লাদাখ অতিশয় বিরাট ও কঠিন গিরিব্যূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্বাভাবিক বন্ধুরের হিসেব ধরে পেছিয়ে যাই। অতীত থেকে বর্তমান কেমন পরিব্যাপ্ত হয়। ভাবি এই মহত্তম পর্বতরাজীর যৌবন নেই তবু নেই। কিংবা হয়তো আছে। কিন্তু পাহাড়ের যৌবন যা ক্ষয় এতই দীর্ঘস্থায়ী যে মানুষের আয়ুতে ধরে পায় না। ঐ পাহাড় আমায় ডাকে, ইশারা করে। আমি পাহাড়ের ঠিক বিপরীতমুখী মানুষ। কোন উচ্চতা নেই, কোন মহত্ত্ব নেই। নির্বর কলকাতায় কূপ-মিন যাপন।

আমরা যেন এক মৃত্যুযাত্রার গোপনে চুপি চুপি অগ্রসর হচ্ছিলুম। অভিজ্ঞ ড্রাইভারেরা অভয় দিয়ে বলেছিলেন, উপসি পর্যন্ত।

এখন আর তেমন কঠিন পথ নেই। তারা নদীর কলোচ্ছ্বাস এ বারও শীতে তেমন নয়। এ পথে সে আমাদের অনেকক্ষণ সঙ্গ দিয়েছে। ভাংলাংলার পথে কোথায় হারালো? আমরা এখন রামলের পর মিক হল উপসি। উপসির পথে এখন একটানা চড়াই তাও নেই। দূর থেকে ক্ষীণতোয়া তারা আবার চোখের সীমানায় ধরা দিয়েছে। দক্ষিণ লাদাখের সিন্ধু তীরবর্তী লৌহঢালপথ উপসি। এ পথে রসদবাহ আছে কিন্তু অতিদুর্গ নেই। তাই এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় দুর্গ আমাদের পথ চলায় বিঘ্ন ঘটায় নি। উপসি থেকে ফাক চলে যেতে পারলে হেমিসের পথ হবে সহজ। এ পথ নিয়মিত মোটর সড়ক পথ। সড়ক পথের কাছে ব্যাপৃত যানবাহন নিয়মিত চলাচল করে। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, সড়কের কাছে নিয়োজিত ট্রাক যা লরি পাওয়া গেলে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যেত ফাক পর্যন্ত। কষ্টের লাঘব হত। দয়াহীন নিষ্করুণ পর্বত মধ্যে দীর্ঘ আট দিন ক্রমাগত পথ চলায় দেহের কোষে কোষে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসাদ ছেয়ে আছে। হেমিসের আস্তানা প্রাণে সাড়া জাগায়। উন্মিত অন্বেষণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে। কিন্তু আর বুঝি পথ সরে না। ফেলে আসা পথের বিপদমুক্তির আশ্বাস এখন চলার গতিকে করেছে মন্থর। এখন দীর্ঘ বিশ্রাম চাই। কিন্তু ঘোড়াওয়ালারা বড়ই বেহুঁশ। ওদের ফিরে যাবার তাড়া আছে। আমাদের ফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার যাবেরা ফিরে যাবে।

এ পথ হেমিসের পথ। এ পথ স্নেহ-র পথ। একটা সুনিশ্চিত আশ্বাসের আভাস। যেন এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করেছি। সে স্বপ্নলোক ভূধরে পাথরে মেখে ধূ ধূ নির্জনতায় বিরাটের অভিনবত্বে বিচিত্র। আমি যেন এ দিগন্তছোঁয়া নিসর্গলোকে বসে শুনতে পাচ্ছি ধর্মচক্রের বাণী "অয় মবিপাদে হুম্"। এখন আমার নিশ্চিত পথনির্দেশ, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"। হাজার বছরের ইতিহাস আবার ওঙ্কারলোকে ভীড় করে আসে।

উপসি থেকে ফাক পৌঁছেছিলুম একদিন পর। আবা ও সিন্ধুর সঙ্গম উপসি। সিন্ধুর কোল ঘেঁষে সিন্ধুর নীলে চোখ ছুঁইয়ে থাকতে থকে এসে পৌঁছেছিলুম তখন বেলা তিনটে। এখানে সেনাবাহিনীর ছাউনি ফেলে মন আশ্বস্ত হয়েছিল। অনেক প্রাণের সমারোহ। এক সুদীর্ঘ চড়চড়ে থেকে নিষ্কাশ্য হয়ে অনেক জীবন প্রবাহে এসে উপস্থিত হয়েছি। এটুকু উত্তাল ভালোলাগা। আনন্দে খাড়ুহারা হয়ে

চিৎকার করে উঠেছিলুম। এ ভাল লাগা আমাদের সকলের। মুহুর্মুহুঃ, অদ্ভিতে, আবার। অদূরে সিন্ধুর জলে পায়ে যন্ত্র-পাহাড়ে সবুজের ছোপ লাগে। এক অপরূপ বৈপরীত্য। পলকার উজোর দলে সারসির ক্ষেত। এই সিন্ধু পেরিয়ে হেমিসের পথ। আজ এখানে পূর্ণ বিশ্রাম। সিন্ধুর অববাহিকায় প্রচণ্ড জলস্রোতে সেচ প্রকল্পের কাজ চলেছে। বন্যা রুখে উপত্যকায় প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা। আর কে না জানে এই সিন্ধুর নীল জল শস্য-জননিকা বাহী।

ভোর হতেই যাত্রা শুরু করেছিলুম। মহা-সিন্ধুর ওপর নির্মিত সেতু পেরিয়ে প্রস্তর সমাকীর্ণ উপত্যকা বেয়ে পথ চলেছিলুম। অদূরে চোর্তেনের সারি হেমিস গুম্ফার নিশানা জানিয়ে দিচ্ছিল। আমরা ক্রমশঃ সুদূর উপত্যকা ছাড়িয়ে পাহাড় অভ্যন্তরে প্রবেশ পাচ্ছিলুম। হেমিসের তোরণদ্বার অসংখ্য লাল, নীল, হলুদ, বিবিধ বর্ণের নিশানে সমাকীর্ণ। গুম্ফা ঘিরে লামাদী পুরুষালী, সুন্দর তরঙ্গিত বর্ণা। অসংখ্য টক, লতা, বৃক্ষের ভিড়। একটা সবুজ শীতলতা হেমিসের পৌরুষ বর্ণে প্রশান্তি এনেছে। আমরা দ্বিতীয় তোরণ দুয়ারের বাঁ দিকে গুম্ফার মূল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিলুম। বয়স্ক লামাদের আনাগোনা, শিশু শিক্ষার্থী লামাদের চঞ্চল খেলাধুলো, মন্দির প্রকোষ্ঠে যন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি, সব মিলিয়ে কেমন একটা অলৌকিক ভাব-প্রবাহ আমাকে সুদূর অতীত অন্তলোকে পৌঁছে দিয়েছিল। কতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম।

স্থপিনাস অট্টালিকা। এ অট্টালিকার নির্মাণকাল লামাদের নিজস্ব। বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুসারী। গুম্ফার গর্ভগৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন অসংখ্য প্রদীপের আলোয় আলোকিত। ঐ আলো আঁধারিতে বাদ্য নিবিষ্ট বিশাল বুদ্ধমূর্তি এবং এই মূর্তিকে ঘিরে মুণ্ডিত-মস্তক লামাদের পুঁথিপাঠ, যন্ত্রোচ্চারণ এবং যন্ত্রোচ্চারণের তালে তালে ঘণ্টার নিনাদ, সিঙ্গার হুংকার অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করে-ছিলুম। ভাবছিলুম ঐসব কি সেই পুঁথি, যে পুঁথি তারতে, লাদাখে, নেপালে, কাশ্মীরে বৌদ্ধ আগমন বার্তা স্মরণীয় করে রেখে গেছে? এবং বহু অনুসন্ধানী মনকে বারবার আহ্বান জানিয়েছে সুদূর লাদাখের অন্তর্গত হেমিস গুম্ফায়? ভাবছিলুম ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ভ্রমণ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের কথা, ভাবছিলুম স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ (১৯৮৮) ও স্বামী অদ্বৈতানন্দের (১৯২০) কথা। গুম্ফাটি প্রায় পাঁচশিখরে ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গুম্ফাসংলগ্ন সকল দিকই দুর্গম পর্বতবেষ্টিত। গুম্ফার অনেক অংশই পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে সংযুক্ত। গুম্ফার তোরণদ্বারে সারবন্দী ছোট ছোট মণিচক্র সাজানো। বড় বড় প্রকোষ্ঠে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি বা কোন প্রত্ন-তাত্ত্বিক মনকে আবেগে আপ্লুত করতে পারে। অপর একটি কক্ষে ত্সাঙ্গ-খাপা-রম-চেন নামক লামাগুরুর প্রতিমূর্তি সাজানো রয়েছে। ইনিই এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঘাঙ্গলাবা নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। স্থানীয় দু একজন লাদাখী গ্রামবাসীর কাছে শুনেছিলুম হেমিসের প্রধান লামা একজন অল্পবয়সী কিশোর। শুনেই দেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। কিন্তু খোঁজ করতেই জানা গেল তিনি এখন দার্জিলিংয়ে অবস্থান করছেন। মনে হয় এখনো এখানকার লামাদের দৃষ্টি তিব্বতের লামা অভিমুখী।

এই মঠে প্রায় তিনশত দুগপা সম্প্রদায়ের লামা ভিক্ষু বাস করে। এদের পরিধেয় বস্ত্রের রং মেরুন ও মাথার টুপি রক্তবর্ণ। ছাদের সর্বোচ্চ ঘরে মঠাধ্যক্ষ বা প্রধান লামা বাস করেন। লামারা মঠাধ্যক্ষকে গাদপো নামে অভিহিত করে থাকে। এক লামাকে কথা প্রসঙ্গে মঠে সংরক্ষিত পুঁথিপত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভাঙা হিন্দিতে জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "বর্তমানে হেমিসে পুঁথিপত্র প্রায় কিছুই নেই। বেশ কিছুকাল পূর্বে মঠের প্রাচীন পুঁথিপত্র তিব্বতের কোন এক গুম্ফায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মহাত্মা বুদ্ধের কাহিনী এঁদের কাছে অজ্ঞাত। গুম্ফার দেয়ালে দেয়ালে নানা বর্ণে বৈচিত্র্যময় বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের ছবি অত্যন্ত যত্নে আঁকা হয়েছে। তাছাড়া জাতকের গল্পের কাহিনী সম্বলিত ছবিও লাদাখী শিল্পীরা সযত্নে হেমিসের অসংখ্য দেয়ালে এঁকে রেখে গেছে। হেমিস দর্শনার্থী পর্যটকদের এখানেই বাসস্থান ও উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে খাদ্য সম্ভার মিলতে পারে। এখন হেমিসের ভবার পর্যন্ত বাস চলে গেছে। প্রতি এপ্রিল বৎসর পরম্পর এখানে বৃহৎ মেলা বসে। নাচ গান হল্লার ধুম হয় এই জনহীন যক পাহাড়ের দেশে। এখানকার মুখোশ-নৃত্য খুবই বিখ্যাত। লাদাখের সর্ববৃহৎ গুম্ফা হেমিস এবং এর বয়-ক্রম ৩৫০ বৎসরের বেশী নয়। প্রায় সাত ঘণ্টা মঠের অভ্যন্তরে অবাক বিস্ময়ে বিচরণ করে কাজ অভিমুখে ফিরে আসছিলুম। উদ্বেগ পাহাড়ে আজই নেহ্ চলে যাবো। তাঁবুর ভেতর আর ভাল লাগছে না। তাছাড়া অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া আর সহ্য হচ্ছে না। শুহাবাসবদৃশ চেহারারও সংস্কার চাই। তাই তড়িঘড়ি নেহ্ যাবার চেষ্টা। সেনাবাহিনীর এক জওয়ান বলেছিল বটে রোড মার্শিলের একটি ট্রাক নেহ যাবে। আমরা শেষ পর্যন্ত ঐ ট্রাকেই সন্ধ্যাভিসারের মধ্যে নেহ্ শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে-ছিলুম। হেমিস থেকে নেহ্র দূরত্ব চল্লিশ কি: মি:। রাস্তার দুপাশে সিন্ধুর অববাহিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। মাটি পাথরে নির্মিত লাদাখী বাড়ির ধূসরতা। এখন লোকালয় চাই একঘেয়ে পথচলা ভাল লাগছে না। নেহ্র

জনজীবনের হাসিকান্নার শরিক হতে পারলে হাড় শরীর মন নরীম হয়ে যেতে যখন চুকতে যাচ্ছিলুম · তখন সবাসত সন্ধ্যাতকার সমগ্র পার্বত্য ভূভাগকে করেছে রহস্যময়। দূরের বৈদ্যুতিক আলোর রেখা প্রতিভাত হচ্ছে। মন আনন্দের হিল্লোল তুলেছে। লোকালয়ের মধ্যে চুকতে যাচ্ছি। পেছনে রেখে আসা এক আত্মঘাতী অতিযান। শুরু করেছিলুম এক ধরণের বিষণ্ণ রিক্ততায়। লেহ্‌র জনে একটা যেন স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া নি। শহরে ঢোকার মুখে চরেন, সন্ধ্যের পার্বত্য শহর জনবিরল। আমরা সহসাই ঢুকে নিয়েছিলুম ভাইনে। এবারে ছাড়তে হল মহাসিন্ধুকে। হঠাৎই নজর কেড়ে নিয়েছিল পাহাড় শীর্ষে স্থাপিত সুবিশাল রাজপ্রাসাদ। রাজার শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত অবস্থান। পাহাড়ের গা কেটে কেটে, পাথর বসিয়ে বসিয়ে রাজা ঙাসী ১৬০০ খ্রীঃ থেকে ১৬৯০ খ্রীঃ মধ্যে এ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

লাদাখের রাজধানী লেহ্‌। রাজপ্রাসাদের কোন একটি অলিন্দে দাঁড়িয়ে লেহ্‌ নগরীর সুবিশাল সমতল ভূভাগ অনেকটা অধচন্দ্রাকার দেখায়। আমরা এখন লাদাখের সর্বোচ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। লেহ্‌র উত্তরে সুবিশাল কারাকোরাম, পশ্চিম ও দক্ষিণে লাদাখ ও জন্মুর গিরিশ্রেণী ঘিরে দক্ষিণ পূর্বে চলে গিয়েছে লাদাখ ও রুপসুর দিকে। এই রুপসুর অনতিদূর উচ্চ প্রস্রবণ ও অনুসরণী পূর্বে পলোকোনকা (১৬৫০০) গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে সবোতিরির (Tsomoriri) প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ লবণ হ্রদ বিস্ময়কর। বর্তমান লাদাখ পাঁচটি তহশীল নিয়ে গঠিত। তাহিস (৯০০০', নরবা (১২৭৬৩'), খ্রাল (১১১১৮) জাস্কার (১৩১৪৪') এবং রুপসু (১৫৭৩৪) জাস্কার লাদাখের প্রাকৃতিক বিভাজন হয়েছে, নদীর প্রবাহমানতার দিক থেকে। যেমন সুরু ভ্যালি, জাস্কার ভ্যালি, ইণ্ডাস ভ্যালি, নুবরা ভ্যালী ও খ্রাল ভ্যালি। সমগ্র লাদাখের আয়তন প্রায় ৩৮০০০ বর্গমাইল। শুধু লেহ্‌ তহশীলের আয়তনই হল ২১৮৪৮ বর্গ মাইল। লাদাখের পূর্বে তিব্বত, দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরে পাকিস্তান ও পশ্চিমে কাশ্মীর। লাদাখের সমুদয় ভূভাগ সমুদ্র সীমা থেকে কোথাও ১০০০' ফুট থেকে ৫০০০' ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির মধ্যে বহির্পৃথিবীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, আঘাত কোন দিন এসে পৌঁছয় নি। নগাধিরাজ অসনন পর্বত চূড়া সমগ্র লাদাখকে কে অবরুদ্ধ করে-রেখেছে। তাই লাদাখীরা ভারতীয় মূল জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও একক।

হান, আর্য ও মোঙ্গল জাতির সংমিশ্রণে

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পারদীয় উৎসব ও ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে রাজ্যের জনগণের কাছে আমার আবেদন, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সঙ্গে উৎসব পালন করুন। কোনো রকম আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। উৎসবের সময় চারা আমাদের মনে কোনো ধরণের ভুলুম যাতে কেউ করতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিশেষ দায়িত্ব।

পথের ওপর উৎসবের এলাকাকে সঙ্কুচিত করবেন না—কারণ এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে দুরূহ সৃষ্টি হয়। মাইকোফোনের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত রাখুন।

উৎসবের সময় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন।

উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখুন ও তা আরো সুসংহত করুন। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের সকল অংশের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্তই প্রয়োজন।

জ্যোতি বসু

আই, সি, এ-২৩২·৪ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লাদাখের জনসমষ্টি তিনটি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন বালতি, ভরপা এবং মোঙ্গলীয় বোধ। এদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর পারীরিক গঠন, বর্ণ ও আচার আচরণে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। লাদাখী বালতি জাতি-গোষ্ঠী বর্তমান পাকিস্তান অধিকৃত উত্তর বালতিস্তান থেকে এসে লাদাখের কার্গিল অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস গড়ে নিয়েছে। এরা অধিকাংশই শিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত। ভরপারা এসেছে তিব্বত থেকে। এরা তন্ত্রীনে মোঙ্গলীয় বোধসম্প্রদায় সম্যাসরিত এবং ধর্মে বৌদ্ধ। লোকে বলে লাদাখ যেন লাদাখ। তুঙ্গ নিসর্গ ও সংস্কৃতি লাদাখীদের নিয়ন্ত্রিত করে। এখানকার অবরুদ্ধ বন্ধুর প্রকৃতি লাদাখী জনসমষ্টিকে করেছে কঠিন, উদার, সহনশীল ও অনমনীয়। এরা একই কালে বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দু বা খ্রীষ্টান। লেহ্‌র রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে ভাংছিলুম চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের কথা। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি লাদাখের তুঙ্গ সংরক্ষিত রাজ্যের ও বুদ্ধাবলম্বিত ভিক্ষা-পাত্র বর্ণন করে গেছেন।

আমার বিস্ময়ের কাঁকে কাঁকে লাদাখী বৃদ্ধ হোটেল মালিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তান হাতের মণি চক্রটি ঘুরেই চলেছিল। প্রথম দর্শনে ঘুরে ঘুরে বলে মালিক জানিয়েছিলেন। এই ঘুরে ঘুরে সম্বোধন তুমি লাদাখের সর্বত্র শুনতে পাবে। এ সম্বোধন, শুভের সৌহৃদ্যের প্রতীক, ভালবাসার প্রতীক। তিনি চোভেতেনের পীঠদেশে অবস্থিত ১০টি চক্রকার লাল বন্ধনী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন ত্রয়োদশ বুদ্ধের কথা। আমরা এখন ত্রয়োদশের অন্বিষ্যে রয়েছি অর্থাৎ কলি যুগের শেষাংশে। কোন কোন চোভেতেন ১০টি চক্রাকার বন্ধনীর পরিবর্তে তিনটি করে গোলাকার পদার্থ স্থাপিত দেখেছি—তিনি গোলাকার তিনটি পদার্থের মর্ম কথা জানাতে বলেছিলেন—প্রথমটি বাসনা (desire) দ্বিতীয়টি আকার (form) ও তৃতীয়টি নিরাকার (formless)।

অবিরাম ঘুরে চলা বর্ণচক্রটির প্রতি আমার নিবদ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে তিনি চক্রটি বন্ধ করে হুক এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বর্ণচক্রের মর্মার্থ।

ওম (AUM)—ঈশ্বর বা স্বর্গ

মা (MA)—মানব (বিরাটাকার বন্ধ)

নে (NE)—প্রাণী

পদ (PAD)—মানব

মে (ME)—অপদেবতা, দৈত্য, পিশাচ

হুম (HUM)—নরক

আমি হতবাক বিস্ময়ে বৃদ্ধের কথা শুনছিলুম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি মহা-সাধক গুরুপদ্মসম্ভবের কথা বলে চলেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনতে থাকি।

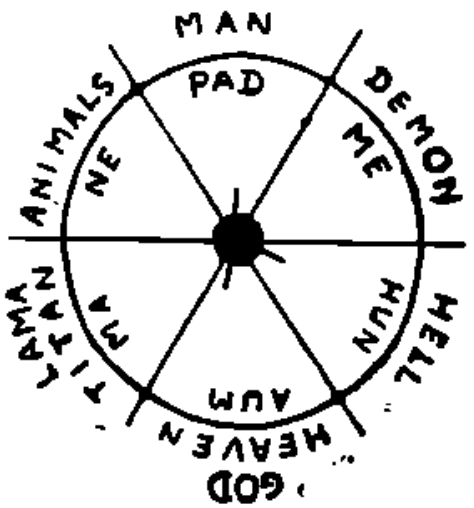

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তার ভবিষ্যৎ

বাদলকৃষ্ণ সেন

বর্তমান শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করে যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি অস্তিত্বের ওটপ্রান্তকে কোন রকমে আঁকড়ে নিজেদের প্রাসাচ্ছাদন করে জীবন ধারণ করে চলেছেন তারাই রাজনৈতিক সামাজিক সংজ্ঞানুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর উৎপত্তি বুর্জোয়াদের একটা আনুষঙ্গিক অংশ হিসাবে। আমাদের দেশে বৃটিশ শাসকদের দাস ও অনুগত হিসাবে ঐ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। ইংরেজ শাসকদের বেওয়া কৃষি সম্পদের অধিকারবলে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের সাম্রাজ্য ও শোষণ রক্ষার জন্য এমন একটা শ্রেণী গড়ে তুলছে যারা শাসক ও শোষিতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে চলতে পারবে। এই শ্রেণীর লোকদের কিছু বাড়তি সুযোগ দিয়ে তারা শোষণ চালিয়ে নিজেদের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছে এবং সাম্রাজ্যের ভিতও সুদৃঢ় করেছে। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের তালুকদারই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধনিয়াদ। পত্তনি ধারণা চালু হবার পর জমিদারদের অবিক্রেয় অংশ হিসাবে এই মধ্যবিত্তেরা আস্তে আস্তে সমাজের উচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। সেই সময় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগ ভূমিস্বত্বের অধিকারী হয়ে তালুকদার হিসেবে গ্রামে বাস করত, আর অন্য অংশ ভূমির স্বত্ব হিসাবে প্রাপ্য কৃষকদের থেকে লুণ্ঠিত সম্পদকে নিয়ে শহরে বসবাস করছিল। গ্রামের সামন্তাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের থেকে শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ছিল ইংরেজ শাসনের প্রতি সমান আস্থাবান ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশধারায় এই শ্রেণী ইংরেজ শাসকদের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে গ্রামের তালুক থেকে যে টাকা আসত সেই আয়ের দ্বারা শহরের অতিপ্রয়োজনীয় খরচ-বহন করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই নানান চাকরী গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়। এরা আস্তে আস্তে হয়ে দাঁড়াল চাকরী সন্ধানী শ্রেণী হয়ে। ইংরেজ সরকার নিজেদের প্রয়োজনে কেরানী সৃষ্টির জন্য ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করে। এই সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের সুযোগ দিয়ে তারা এক মধ্যবিত্ত ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি করে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুপ্রাণিত করে তুলল। নানান সরকারী চাকরীর সুযোগও এদের কাছে এসে গেল। এই ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা। এই উদ্দেশ্য অনেকটাতে সফলও হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই ভারতের প্রত্যেকটি কৃষক-বিদ্রোহে বিশেষত সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের সময় এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এই সব বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে এবং ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ হয় ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে। ছেলে কৃষি ও চাকরীর ক্ষেত্রে তখন সঙ্কট দেখা দেয়। এর দ্বারা গ্রামের ও শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই দুই শ্রেণীর লোককে অর্থনৈতিক অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিক্রিয়ার একটা অংশ বৃটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ হয়ে উঠল। এই প্রতিক্রিয়াশীলতার উৎস ছিল য়ুরোপীয় সাহিত্য। বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য থেকে এরা লাভ করেছিল ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চিন্তাধারা এবং এই সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের নিকট এসে পৌঁছাল পুঁজিবাদী ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব। এই প্রভাব তাদের শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর দ্বারা এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সৃষ্টি হল। তদানীন্তন বঙ্গদেশে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৈদেশিক শিক্ষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় গণতান্ত্রিক ভাবধারা গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু সেই ভাবধারাকে নিজের শ্রেণীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রগতির ভূমিকা নিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের ধারা উনবিংশ শতাব্দীর "নব জাগৃতি" আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বৃটিশ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বটে তবে এই দেশ থেকে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ হক এটাও এদের কাম্য ছিল না। সেইজন্য দেখা গেছে বৃটিশ বিরোধী ভাবধারার এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটা অংশ চাইছিল বৃটিশের সঙ্গে দরকষাকষি করে কিছুটা সুযোগ সুবিধে আদায় করে ইংরেজ শাসনের ছত্র-ছায়ায় থাকতে। আর একটা অংশ চাইছিল বিপ্লবী কর্মপন্থার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বৃটিশদের এই দেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করা। এই দুই ধারার আন্দোলন ছিল শুধু মধ্যবিত্ত ও কিছুটা

উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এর মধ্যে এসে পড়ল ১৯৩০ সালের দুনিয়া-কাপানো অর্থনৈতিক সঙ্কট। স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়মে আমাদের দেশের সঙ্কটও সেই একই রকম অবস্থায় এসে দাঁড়াল। শিক্ষিত যুবকেরা হন্যে হয়ে চাকরীর আশায় নানা অফিসে ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ধর্না দিতে আরম্ভ করল। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। এর দ্বারা পুরে যে বিত্তের আনুকূল্যে এই সব মধ্যবিত্তরা সমাজে এতদিন আধিপত্য করে আসছিল তা আজ আজ অতীতের কাহিনী হয়ে দাঁড়াল। সমাজের এই নিম্ন নতুন করে তাদের আগের ঐতিহ্য ও গর্ব ভগবার গল্পে পর্যবসিত হল।

অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারায় যারা এতদিন প্রকৃত মধ্যবিত্ত বলে চিহ্নিত হয়েছিল তাদের বিত্তের ঘর এখন শূন্য। বেঁচে থাকার সংগ্রামে এরা এখন পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। রোজারই সর্বহারার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা এখনও এই মধ্যবিত্ত নাম ধারণ করে থাকার সৌভাগ্য বজায় রেখে চলেছে তারা কোন রকমে নিঃস্বতার লজ্জা মধ্যবিত্তের নিজের খানিকটা ভূষণ করে রয়েছে। অতীতে মধ্যবিত্ত বলতে একটু অতিরিক্ত বিত্তবান শ্রেণীর লোকদের বোঝাত। কিন্তু বর্তমানে এই অতিরেক একেবারে বাতিরেকের ঘরে। অর্থাৎ বিত্তের ঘর একেবারে খালি। এই শূন্যতার মধ্যেও এই শ্রেণীর প্রভাব বলতেই হবে খুব ছোট নয়। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজ চেতনায় আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই দিক থেকে বিচার করলে এই শ্রেণীর অবদান একটা গৌরবময় ইতিহাসের মত বিস্তৃতবিস্তারিত। বিত্তের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকলেও এদের বুদ্ধি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ ও নিম্নের সঙ্কটের হাই-ড্রলিক চাপে এরা এখনও নিজের শ্রেণীকে ধরে রয়েছে। তবে বিলীন হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তবু তথাকথিত মধ্যবিত্তের আবরণের খোলস ধারণ করে কোন রকমে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আজ এই নিশ্চিহ্নপ্রায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকারময়। এর ফল হিসাবে এই শ্রেণীর যুবকেরা হতাশায় ভুগছে। বিভ্রান্ত হয়ে নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। রাতারাতি রাজনৈতিক নেতারা এই সব হতোদ্যম যুবকদের মনে দিয়ে যাচ্ছে নানা অসামাজিক কাজে। বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার আশায় এরা সরকারী ও বেসরকারী ইস্তেহারে আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। কালেভদ্রে এই পত্রদানেরা ছেলেদের নিয়ে আসে এদের মধ্যে উপর বিতৃষ্ণাজনিত। আজ আজ ভগ্নহৃদয় ও আত্মহীন অর্থলোভী ওঝা ও তাবিজদার হিসাবে। মোটকথা এরা ওঝাবাজীর দল বৃদ্ধি করছে। ফলতঃ হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিভ্রান্তের নিম্নের হয়ে যাচ্ছে।

এই হল বর্তমান ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা। এই চিত্র যে কত ভয়ানক আকার ধারণ করেছে তা কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। এখানকার পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ এটা বলা যায় না। হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকেরা কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখাতে যেতে চায় না, কারণ তারা মনে করে চাকরীর নামে শুধু হয়রানি ভোগ করা হয়। হালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকারভাতার প্রবর্তন করায় কর্মসংস্থান কেন্দ্রে ছেলেরা নাম লেখাতে ভীড় করছে। এর থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা ভয়াবহতা কত গভীরে। তবুও এই শ্রেণীর লোকেরা বাহ্যিক আভিজাত্য বজায় রাখতে প্রতিনিয়ত কত অভিনয় করে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে সরকারী চাকুরীর আশাতেও নিয়ম ও বিপর্যস্ত হয়ে নির্লজ্জ বেহায়াপনার ছেড়ে পরিবারকে ঘুরে রাখতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদেরও চাপ সহ্যের একটা পরিসীমা রয়েছে। একদিন না একদিন ভেঙে পড়বেই। তবুও বলতে হয় ঐ ভেরাসিমুলের মুখোশ ধারণ করার একটা ক্ষমতা আছে, তবে আবরণের ভেতরকার মর্মজ্বালা যে কি জীবন্ত দুঃসহতোদী ছাড়া অন্য কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবে না। প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধে হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভেরাসিমুল যে কোন অনুকূল সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সমস্যার ব্যাপ্তি ও নানান লোন অফিসের নজীরের হিসাব থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এটা হল চাকরীজীবী মধ্যবিত্তের বিরাট অংশের অবস্থা। বাজারে সস্তায় পচা মাছ কিনে এরা কাগজের আড়ালে ঢেকে বাড়ী নিয়ে যায়। এই সঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা খুবই মর্মান্তিক। এই মধ্যবিত্ত সমাজে এরা নিজের সম্ভ্রম ও মর্যাদা রাখার চেষ্টায় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই পচা মাছের অভিনয় করে চলেছে। এইভাবে চলতে হলে জীবন সংগ্রামে এদের হেটসিয়ার খাতায় নাম লেখাতে হবে এই সত্য উপলব্ধি করার সময় এসেছে। রোজই সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখা যায়, আত্মহত্যা, ছিনতাই, প্রবঞ্চনা, হত্যা, ডাকাতি ও এইরকম অন্যান্য অপরাধ প্রবণতার খবর। এদের উৎস কিন্তু এই মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সমস্যার এক করুণ ও দায়িত্বিক ছবি।

তবে এই মধ্যবিত্ত সমাজের আর একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। এরা মনে করে জীবন সংগ্রামে হতাশার কোন স্থান নেই। তারা উপলব্ধি করেছে বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রাম করে নিজেদের দাবী আদায় করতে হবে। এরা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কারণেই এদের মুক্তির বিশানা খুঁজে পেয়েছে শোষিত

মানুষের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে। মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এরা বুঝতে পেরেছে সমাজ বিপ্লব একটি বাস্তব ঘটনা। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের বিজয় একটি ঐতিহাসিক সত্য ও সমাজ-বিজ্ঞানের শ্রীটা অমোঘ নিয়ম। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ এই সত্যকে এড়িয়ে চলতে পারে না। অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের পচন ও গলন শুরু হয়েছে। কাজেই মেহনতী মানুষের সঙ্গে এদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। পুঁজিবাদী সামন্তবাদী অবক্ষয়ের পাশাপাশি শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের একটি বিপ্লবী শক্তি দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কাজেই সমতান্ত্রিক ও শ্রেণী সংগ্রামের তাত্ত্বিক মতাদর্শের উপর নির্ভর করে শ্রমিক ও কৃষকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্যকে বিলুপ্ত করার দিকে এগুতে হবে। মধ্যবিত্তের একটা অংশ এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাই এই শ্রেণীর কর্মচারীরা নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তাদের আন্দোলনরত ও কর্মচারী আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই কর্মচারীদের আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্যও রয়েছে। ভারতবর্ষে সমস্ত সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে এরা ধর্মঘট ও নানা ধরনের আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেদের সংহতি প্রকাশ করেছে বহুবার।

কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর একটা অংশ সমাজ বিপ্লব স্বার্থান্বেষী আন্দোলন ও কোলাহলমান অবস্থায় রয়েছে। এখনও তাদের শ্রেণীর পুরোনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। তবে থাকা না থাকার সীমায় এসে গেছে। এই প্রচেষ্টা খুবই মর্মান্তিক ও নাটকের ট্র্যাজিক মানুষের সমতুল্য। তারা শ্রমজীবী মানুষের, এমন কি নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে চলেছে।

এই হল বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছুটো দিক। এখন প্রশ্ন জাগছে এই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে না ছুরিয়ে গেছে। এই সব প্রশ্নের সহজ উত্তর হল এই শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত জন সমষ্টিকে বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিজের সঠিক পথকে বেছে নিতে হবে। জানতে হবে এবং বুঝতে হবে এই বিপুল সংখ্যক লোকের বেকারত্বের কারণ কি? এর মূলেই বা কি? তারপর সরকারের এক একটা পাঁচশালা পরিকল্পনার ফলে সমস্ত শহর ও বড় বড় নগরে গড়ে উঠছে। চমৎকার বহুতল বাড়ী, দালানের বড় বড় ব্যবসা, নতুন রেলপথ ও নানা শিল্প গড়ে উঠছে। কৃষিতে ও শিল্পে অটোমেশান ও অন্যান্য উন্নত পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। এত সব উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যেও কেন দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। আজ দেশের ৭০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের শ্রমজীবী ও ছোট খাওয়া মানুষ তাদের পরিবার পরিজনের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে দিন রাত প্রাণপাত করে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। দেশের এই বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছে টাটা বিড়লা প্রভৃতি ১৫টি ধনিক পরিবার। এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে মুক্তি আসবে না। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—যাকে বলা হয় সেটি বুর্জোয়া—অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অবক্ষয় সুরু হয়ে গেছে। মার্কস কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহারে বহু পূর্বে যার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, "আধুনিক সভ্যতায় যে সব দেশ সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছে সেখানে আবার সেই বুর্জোয়ার নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোলায়িত। বুর্জোয়া সমাজের আনুষঙ্গিক একটা অংশ হিসাবে বার বার নতুন হয়ে উঠেছে এরা। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোক কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমাগত প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমান মধ্যবিত্তের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এরা এমন কি এও দেখে যে সময় এগিয়ে আসছে যখন আধুনিক সমাজের স্বাধীন অঙ্গ হিসাবে এদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে এদের স্থান গ্রহণ করবে তত্ত্বাবধায়ী কর্মচারী, দোকানদার অথবা দোকান কর্মচারী।"

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা

কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ মূলত ভাববাদী দর্শনের উপরেই তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে রূপায়িত করেছেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের যে নবচেতনার মূল চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ধনিয়াদ স্থাপন করল তার একটি প্রধান দিক হল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ভূমিকা ও মহিমা আবিষ্কার। দেশ ও কালের অদৃশ্য অস্তিত্বের ধরলে নির্দিষ্ট দেশ ও কালের পটে মানুষের মূল্য উপলব্ধি নবচেতনার প্রধান দিক। যে মানবতার মহান আদর্শ তাঁরা উপলব্ধি করলেন তা কালনিরপেক্ষ নয়—বিশেষ সামাজিক ও দেশগত সীমার অর্থাৎ জাতীয় চেতনার উপলব্ধির মধ্যেই তা রূপ লাভ করল। রামমোহন ভূদেব, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি চিন্তাবিদেরা সমকালীন ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই নতুন মানবতার আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই স্পষ্টভাবে ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেন এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে ইতিহাসের ভূমিকাকে অসামান্য গুরুত্বদান করলেন।

এই নবচেতনার প্রবাহধারার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস চেতনা ও ইতিহাস চর্চার পরিচয় রেখেছেন। একজন কবির উপলব্ধিতে ইতিহাসের স্বরূপ অবিসংবাদিতভাবে ফুটে ওঠে তাঁর কবিতার মধ্যে। ইতিহাস বিষয়ক বহু রচনার থেকেও তাই কবির কয়েকটি কবিতার মধ্যেই তাঁর ইতিহাস চেতনার সবচেয়ে সত্য পরিচয় লাভ করা যায়। তাই প্রথমেই কবির দুটি প্রসিদ্ধকাব্য থেকে তাঁর ইতিহাস চেতনার পরিচয় গ্রহণ করব।

'কথা ও কাহিনী'র ১০৬ সংখ্যক কবিতা—যা 'ভারততীর্থ' নামে পরিচিত এবং ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকৃত "জন গণ মন অধিনায়ক" এই দুটি কবিতার মধ্যে ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতা আবেগাশ্রিত। এই দুটি কবিতাও আবেগেরই রূপায়ণ। তথাপি এই আবেগ মহান কবির ভারত ইতিহাস সম্পর্কিত চিন্তা ও উপলব্ধির ঘনীভূত রূপ—একথা বলা যায়।

প্রথম কবিতা "ভারত-তীর্থ" বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

১। ভারত—"মহামানবের সাগর।"

নানা যুগে নানা মানুষের ধারা এসেছে ভারতে এবং আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূন, পাঠান, মোগল "এক দেহে হ'ল লীন।"

২। এই নানাকে ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তপস্যার দ্বারা "একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া……তাহারে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।"

৩। সেই সাধনা—মহা ঐক্যের চেতনাই ভারত ইতিহাসের চরম লক্ষ্য।

৪। সেই সাধনা থেকে এই হওয়ার আজ "দুঃখের রক্তশিখা" জ্বলছে ভারতে।

৫। এ দুঃখ বহন করতে হবে, "একের তান" শোনার সাধনায়।

৬। এই দুঃখ বহনের দ্বারাই পরম ঐক্য লাভ সম্ভব। সর্বজাতি-সমন্বয়েই মহা ঐক্য ভারত ইতিহাসের চরমতম পরিণতি।

এই চরম পরিণতি বিধাতা-নির্দিষ্ট। এই ভাববাদী (idealist) সিদ্ধান্তের ওপর 'জনগণমন' কবিতাটি রচিত। কবি বলেছেন—ভারতের জনগণমনের অধিনায়ক ধ্রুবের। ভারত ভাগ্য বিধাতা।

"পতন অভ্যুদয়, বন্ধুর পন্থায়" যুগে যুগে ধাবিত ভারত ইতিহাসের তিনিই চিরসারথি। তাঁর কবির জয়ধ্বনিতে উপনত হক।

অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ হচ্ছে ভারত ইতিহাসের ক্রমবিকাশে এবং তার এক পরিণতি হল বিশ্বমানবতার ঐক্যলাভের সাধনায়।

কবিতার উপলব্ধ এই ইতিহাস চেতনাকে এবার আমরা চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনুসরণ করব।

ইতিহাস বা ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ২৮টি রচনা আছে। এর মধ্যে ১৩টি হল ইতিহাসের তত্ত্বগত আলোচনা।

॥ আত্মশক্তি ॥

১। স্বদেশ কী ২। ভারতবর্ষীয় সমাজ ৩। স্বদেশী সমাজ (অংশতঃ ভারত ইতিহাস আলোচনা) ৪। দেশীয় রাজ্য

॥ সমূহ ॥

৫। বিরোধীমূলক আদর্শ

॥ স্বদেশ ॥

৬। ভারতবর্ষের ইতিহাস ৭। ব্রাহ্মণ ৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

॥ সমাজ ॥

৯। ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১০। হিন্দুর ঐক্য ১১। পূর্ব ও পশ্চিম ১২। আদিম আর্য নিবাস।

॥ পরিচয় ॥

১৩। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

॥ কালান্তর ॥

১৪। বৃহত্তর ভারত

॥ ইতিহাস ॥

১৪। ভারত ইতিহাস চর্চা

পেরোক্ত প্রবন্ধ "ভারত ইতিহাস চর্চা" অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ভারত ইতিহাসের কয়েকটি মূল তত্ত্বের সন্ধান পাই –

"ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে"

"প্রত্যেক জাতির একটি একটি সাধনার বিষয় আছে। সেই মূলগত সাধনাটি লইয়াই সেই জাতির সকল লোক খাটে যাচে।"

"প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন চেষ্টাই মানুষের ধর্ম। সত্যতাই এই মিলন।১

"আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি সম্প্রদায়ের।··· একদিকে যেমন পরস্পর লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর একদিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টারও বিরাম ছিল না।"২

"আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মতত্ত্বমূলক"৩ অর্থাৎ

ক। ভারতের ইতিহাস রাজনৈতিক (Political History) নয়

খ। ভারতের ইতিহাস সামাজিক—ধর্মীয়।

গ। প্রত্যেক জাতির একটা সাধনার বিষয় থাকে।

ঘ। ভেদ বা অসামঞ্জস্য—জাতির সমস্যা।

ঙ। অসামঞ্জস্য ঘুচিয়ে মিলন চেষ্টাই সভ্যতা।

চ। প্রাচীন ভারতে এই অসামঞ্জস্য ছিল। তা দূর করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সাধনার বিষয়।

ছ। এই অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না—অর্থাৎ তা Political ছিল না, এটা ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের।

জ। সামাজিক ও ধর্মীয় অসামঞ্জস্যের মধ্যে এক মহান ঐক্যসাধী সামঞ্জস্য সাধনই ভারত ইতিহাসের মূলধারা—এবং "মূলগত সাধনা।"

দেখা যাবে যে প্রথমে উল্লিখিত কবিতা সৃষ্টির মূল বক্তব্যই এই প্রবন্ধেরও বক্তব্য। এবং এ হল রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্পর্কে মৌল সিদ্ধান্ত।

এ সিদ্ধান্ত যথার্থ কি না সে বিচারে এখানে যাব না। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এমনভাবে আমাদের দেশে স্বীকৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নিশ্চিত সমাজে যেন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।৪

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের জাতীয়তাবোধ ভিত্তি হিসাবে ধর্ম ও জাতিগত ঐক্যের কথা আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যায় নবগোপাল মিত্রের "জাতীয়" পত্রিকায় (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু)। নবগোপালের বক্তব্য ছিল যে জাতীয়তাবোধের প্রধান ভিত্তি হল ঐক্য এবং ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হল হিন্দুত্ব।

"Hindu nationality is not confined to Bengal. It embraces all of Hindu name and Hindu faith throughout the length and breadth of Hindusthan; ···The Hindus are destined to be a religious nation."৫

রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের সঙ্গে পরম ঐক্য সাধনার তত্ত্ব কিন্তু পূর্ববর্তী ইতিহাস আলোচনায় পথিকৃৎ বঙ্কিমের আলোচনায় স্বীকৃত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' কয়েকটি প্রবন্ধে বাঙালার উৎপত্তি আলোচনা করেন। প্রথম প্রবন্ধ 'বাঙালার উৎপত্তি'৬ এবং আরও দুটি প্রবন্ধে বাঙালী জাতির উৎপত্তি আলোচনায় মূলতঃ প্রাচীন ভারতের জাতিগত বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন।

তাঁর মূল বক্তব্য হল :

ক। প্রাচীন আর্যরা বঙ্গদেশ অধিকার করলে বেশ কিছু অনার্য বিতাড়িত হয়ে চলে যায়।

খ। বৈদিক যুগে দাস বা দস্যু নামধারী অনার্যরা আর্যদের থেকে পৃথক ছিল এবং তাদের "স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।"

গ। সব দিক থেকেই আর্যদের সঙ্গে তাদের ভিন্নতা ও শত্রুতা ছিল। (প্রথম প্রবন্ধ)

ঘ। বাঙালার উত্তর সীমায় বঙ্গ এবং মধ্যাঞ্চলে বঙ্গ অনার্য জাতির বাস। এই অনার্যদের তিনি "পুরাতন" এবং "স্থানের" আর ভাষাগোষ্ঠীর বিচারে 'দ্রাবিড়' ও 'কোল' এই দুভাগে ভাগ করেছেন।

শেষ প্রবন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত হল—

"ইংরেজ টিউটন ও স্লেভ ও নরমান এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে···কিন্তু ভারতীয় আর্যদিগের বর্ণধর্মের হেতু বাঙালায় তিনটি পৃথক স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই, আর্যসঙ্কুত দ্রাবিড় অনার্যসঙ্কুত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন।

·····ইংরেজ এক জাতি, বাঙালীরা বহু জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার

এ প্রবন্ধের সমস্ত বোল্ড টাইপ এবং ইটালিকস বর্তমান প্রবন্ধকারের

বাঙালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য। হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য। হিন্দু আর হিন্দের পর এক নতুন জাতি বাঙালী মুসলমান।[৭] উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য। এইজন্য হুর হইতে দেখিতে বাঙালী জাতি অবিমিশ্র আর্য জাতি বলিয়াই বোধহয়।"[৮] আরেকটি গ্রন্থে রমিল মন্তব্য করেছেন যে আর্য ও অনার্যের মধ্যে রক্ত ও আচারের ঐক্য কোনদিনই হতে পারেনি এবং হিন্দু এক জাতি হয় নি।[৯]

দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় ইতিহাসের এক-দুখিতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিধাতার নির্দেশে ভারত ইতিহাসের বিকাশ,—এই ভাবনাটি তত্ত্ব ন্যাশনালিষ্ট রমিলের ছিল না—এবং স্পষ্ট ও বিশদভাবে রবীন্দ্রনাথই ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে প্রথম এ তত্ত্ব প্রচার করলেন।

॥ দুই ॥

এর দুটি কারণ নির্দেশ করা যায়। একটি হ'ল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার ও খননকার্য এবং কিছু প্রখ্যাত পাশ্চাত্য ভারতবিদের লেখায় ভারতীয় মানসে প্রাচীন ভারতের মহিমা ও গরিমা ফেলে ওঠা।[১০]

উনিশ শতকের মানবতার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চিন্তাবিদেরা প্রাচীন ভারতের সৌভ্রাত্রবন্ধন আদর্শের ওপর স্থাপিত করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের জন্য অনেকজন পাশ্চাত্য মনীষী ও ধর্মবিদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাস চর্চার সূচনা করালী ইতিহাসবিদের উল্লেখ ও তাঁদের লেখা আলোচনা করেছেন। এঁদের একজন হলেন রেনা (Arnest Renan)। এঁর রচনা উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাংলা দেশে আদৃত ছিল মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের সমকালে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এদেশে এসেছিল। তার মধ্যে একটি হল বাঙালী বাগবিধায়ী মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত গ্রন্থ।

১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধ লেখেন "নেশন কী" এবং "ভারতবর্ষীয় সমাজ"। দুটি প্রবন্ধই রেনাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। প্রথম প্রবন্ধে "নেশন" সম্পর্কে রেনাঁর অভিমতই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। "..... জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন নামক মানব-পদার্থ গঠনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?

"নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তর প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। ...একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ আর একটি পরস্পর সম্মতি।"

"অতীতের গৌরব, বহুত্ব, কীর্তি ইহার উপরেই জ্ঞানবান ভাবের মূল পত্তন।"[১০]

"রেনাঁ বলেন "অনেকগুলি সহৃদয়তা ও ভাবোন্নত হৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘে যে একটি সচেতন চারিত্র সৃষ্টি করে তাহাই নেশন।"[১১]

আমরা রেনাঁর মূল রচনা (ইংরেজী অনুবাদে) উদ্ধৃত করছি—

"Nation, such as France, Germany···behave like persons possessed of a character, a mind, and definite interests,···they have, like the living being, a secret instinct, a feeling of their essence of their conservation." ১২

"The organic cell is···a minute personal concentration: several cells in harmonious co-operation constitute a consciousness of the second degree (man or animal). A plurality of consciousness of the second degree forms, by association in groups, a consciousness of the third degree—such as the consciousness of···nations growing out of millious of individuals living on the same idea and endowed with sentiments in common." ১৩

"A select body of intelligent beings, possessed of the most important secrets of reality, would rule the world." ১৪

এই উদ্ধৃতি তিনটি থেকে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বালোচিত প্রবন্ধটি রেনাঁর এই সব রচনার প্রায় ভাবানুবাদ।

পরবর্তী "ভারতবর্ষীয় সমাজ" প্রবন্ধটিতে রেনাঁর উক্তি এবং উল্লেখ তো আছেই তা ছাড়া প্রথম প্রবন্ধের আলোচিত "নেশন" তত্ত্বের ওপরই এ প্রবন্ধের আলোচনা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রবন্ধের "একটি সজীব সত্তা" "একটি মানস পদার্থ"—যা রেনাঁরই বক্তব্য—এই "একত্ব" আবিষ্কার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজ ইতিহাসে।

"হিন্দু সভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন সব জাতীয় জাঠ ও রাজপুত ও নিম্ন জাতীয় নেপালী, নায়ার সকলে আপন ভাষা, ধর্ম, কর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। (শতঃ রঃ রঃ। ১২। পৃষ্ঠা ৬০০)

এই সামঞ্জস্যপূর্ণ হিন্দুত্বের মূল কোথায় তা সন্ধান করে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন "আমাদের দেশে সমাজ সকলের বাড়া।"(ঐ)

এবার উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে রচিত "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সভ্যতা" প্রবন্ধটির। এই প্রবন্ধটি মূলতঃ ফরাসী ইতিহাসবিদ মনীষী Guizotএর "History of Civilazation in Europe" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "ফরাসী মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমাদের আলোচনার যোগ্য।" "তিনি বলেন, আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এশিয়ায়, কি অন্যত্র, এমন কি প্রাচীন গ্রীসে রোমেও সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রত্যেক সভ্যতা যেন·····একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

(দ্রঃ রঃ শত। ১২। ১০৫৫)

"প্রাচীন সভ্যতা মাত্রেই একটা না একটা কিছুর আধিপত্য ছিল। সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত। এই ঐক্য এই সরলতার ভাব সাহিত্যে এবং লোক সকলের বুদ্ধি চেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত। এই কারণেই প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চরিত্র গ্রন্থে, ইতিহাসে, কাব্যে সর্বত্রই একই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়।"

(ঐ পৃঃ ১০৫৬)

"গিজো বলেন, বিষয়জগতের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের সংগ্রাম। ·····বিশ্বের নানা শক্তি, নানা তত্ত্ব, নানা ভাব জড়িত হইয়া যুদ্ধ করে, পরস্পরকে গঠিত করে, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে না·····অথচ এই সকল ঘটনা, তত্ত্ব ও ভাবের বৈচিত্র্য, তাহাদের সংগ্রাম ও মেল একটি বিশেষ ঐক্য, একটি বিশেষ আদর্শের অভিমুখে চলিয়াছে।·····য়ুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ চিরন্তন সত্যের পথ পাইয়াছে, তাহা ভগবানের কর্মপ্রণালীর দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বর যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে।" (ঐ পৃঃ ১০৫৭)

গিজোর মূল রচনা উদ্ধৃত করলে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ এবং সাময়িক ইতিহাস দর্শনের ওপর গিজোর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

"...There is an European civilization, *That a certain unity pervades* the civilization of the various European states, that not withstanding *infinite diversities* of time, place and circumstances."[১৫]

for my own part, I am convinced that there is, in reality, a general destiny of humanity, transmission of the aggregate of civilization, and consequently, an universal history of civilization to be written."[১৬]

"When we regard the civilizations which have preceded that of modern Europe, whether in Asia or elsewhere,...It is impossible to help being struck with the unity which pervades them. They seem to have emanated from a single fact, from a single idea, one might say that society has attached itself to a solitary dominant principle..."

"In Egypt for instance, it was the theocratic principle which pervaded the entire community...In India, you will discover the same fact; In short, when we contemplate ancient civilzation, we find them stamped with *a singular character of unity* in their institutions, their ideas, and their manners. [১৭]

এইসব সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে কিন্তু "The war was always terminated by the if not exclusive, atleast largely prepondering, domination of some particular principle." এর ফলে হয়েছে "*remarkable simplicity* in the majority of ancient civilizations....

"The character of unity of civilizaation is equally stamped upon literature and the works of the mind, who is unacquainted with the monuments of Indian literature-- they are all cast in the same mould, they seem all to be the result of the same fact, the expression of the same idea. [১৮]

য়ুরোপীয় সভ্যতায় diversity and variety of elements এর তীব্র সংঘর্ষ চলছে, কিন্তু সবই চলেছে "after a certain unity"—এক ঐক্যের অভিমুখে।

"Eurobean civilization has entered into the eternal truth, into the *plan of Providence*, it progresses *according to the entertions* of *God*." [১৯]

এই উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও প্রয়োজনীয়। গিজোর মূল রচনার সঙ্গে গিজো অনুসারী রবীন্দ্রনাথের আলোচনার ধ্বনির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আর গিজোর কয়েকটি প্রধান বক্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস দর্শনের প্রেরণা তাও লক্ষ্য করা যায়। গিজো

য়ুরোপীয় সভ্যতার infinite diversities এর মধ্যে 'unity' দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথও ভারত ইতিহাসে তা উপলব্ধি করেছেন একই সঙ্গে প্রয়োগ করে।

সিজো প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সভ্যতায় ধর্মীয় আদর্শকেই ("theocratic principle") প্রধান ও এক আদর্শ—solitary dominant Principle" বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন "আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মতত্ত্বমূলক"। সিজো সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে 'single idea' 'a solitary dominant principle' এর কথা বলেছেন—রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কথাই বলেছেন যে, "প্রত্যেক জাতির একটি সাধনার বিষয় আছে।"

সিজো প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন সংঘাত ও যুদ্ধ চলার মধ্য দিয়ে যে "War was always terminated by the···domination of some particular principle."এর কথা বলেছেন—"একের অনেকে বিস্তার আহুতি" দেবার ভারত ইতিহাস তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথও সে কথাই বলেছেন। সব থেকে বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার তীব্র বহির্মুখীনতার সত্ত্বেও যে তা ঈশ্বর নির্দিষ্ট মহা ঐক্যের পথে চলেছে—"into the eternal truth, into the plan of providence," ভাববাদী সিজোর এ উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথও ভারত সম্পর্কে এই উপলব্ধির কথাই প্রকাশ করেছেন—তাঁর পূর্বালোচিত কাব্য দুটিতে এবং নৈবেদ্যের একাধিক সনেটে।

মানবেতিহাস যে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরেরই বিধান—তা রেঁনারও বক্তব্য ছিল, রেঁনার জীবনীকার ওয়ার্ডম্যান তাঁকে "Hegelian" বলেছেন। ২০

রেঁনা। এবং সিজো এই দুই ফরাসী চিন্তাবিদের প্রেরণা থেকেই যে রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসে "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের" এবং তা "ঈশ্বরেচ্ছার প্রকাশ" এই তত্ত্বের উপলব্ধিতে উপনীত হন—তাতে সন্দেহ থাকে না। পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধ দুটি লেখার তিন বছর পরে এই "ঐক্য ও মানুষ" তত্ত্ব ভারত ইতিহাস প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ সালের ভাদ্রের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। তিনি লিখলেন—"বিধাতা যেন একটি বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো চাষারনিক কারখানা খুলিয়াছেন।"

"এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে প্রথিত করিয়া দিয়াছে।" (শতঃ র: খ: ।।১৭।। পৃ: ৭২৮)

"ঘরে ঘরে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।" (ঐ, পৃ: ৭০১) আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে এই তত্ত্ব উপস্থাপন বিশিষ্ট সমাজে অভিনব বলে বোধ হয়েছিল এবং পত্র পত্রিকায় উত্তেজনা এবং প্রতিবাদও দেখা দিয়েছিল—তার প্রমাণ আছে খোদ রবীন্দ্রনাথেরই লেখায়—

"আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দু সমাজকে একাকার করিয়া দিবার মতলব আঁটিয়াছি, "বঙ্গবাসীর" কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন।" ২১

॥ তিন ॥

দার্শনিক চিন্তার দিক থেকে রোমান্টিক আদর্শের অনুসারী রবীন্দ্রনাথ এই ফরাসী

তন্তুশ্রী

বাংলার তাঁতশিল্প আমাদের গৌরব। আসুন আপনার আমার সক্রিয় প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় বাংলার এই ঐতিহ্যময় কুটিরশিল্পকে জীবন্ত করে তুলি। ঠাসবুননের চমকপ্রদ তাঁত বস্ত্রের বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে আপনাদের সেবায় আজ নিবেদিত 'তন্তুশ্রী'। 'তন্তুশ্রী' আপনাকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম
ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
(রাজ্য সরকারের সংস্থা)
৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল)
কলিকাতা-৭০০০১৩
ম্যার্কেটিং বিভাগ—১এ, অভয় গুহ রোড, কলিকাতা-৬
বিক্রয় কেন্দ্র—কলিকাতা, নয়াদিল্লী, আগরতলা (ত্রিপুরা), বাঙ্গালোর ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র।

চিন্তাবিবরের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কিন্তু ভাবনার ভাববাদেরই অনুসারী। মানবেতিহাস যে ঈশ্বর-বিধানের অনুসারী এ বিশ্বাস হেগেলীয় ছিল বলেই তাঁকে Hegelian বলা হয়েছে। মানব ইতিহাসের তিন স্তরে চৈতন্যের ক্রম-অভিব্যক্তির যে গভীর বিশ্লেষণ তিনি করেছেন—তাকে তাঁর জীবনীকার ওয়ার্কম্যান "Grandiose Hegelian programme" বলেছেন। ১২

আবার গিজো যে বিশ্বের সমস্ত নানাত্ব ও বৈচিত্র্যের পরম সত্তার অভিমুখী এক বৃহৎ সমন্বয়ের আদর্শই য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশে লক্ষ্য করেছেন—তার মধ্যেও জার্মান দার্শনিকদেরই প্রতিফলন দেখা যায়।

শেলিং ইতিহাসে পরম সত্তা—absolute-কেই দর্শন করেছেন। ফ্লিণ্টউড বলেন—"There are, according to Schelling, two great realms of the Knowable: Nature and History. Each...is a manifestation of the Absolute." ২৩

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শেলিংএর বিখ্যাত "System of Transcendental Idealism" গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে একটি স্তরে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এবং পরবর্তী-স্তরে ইতিহাসের মধ্যে Absolute কে উপলব্ধি করে। ২৪

গিজোর যে সিদ্ধান্ত সমাজ-ইতিহাসের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি হল ঈশ্বরেচ্ছার—"Progress according to the intensions of God"—তা মূলত হেগেলেরই দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি। হেগেলের বক্তব্য: The Principles of the successive phases of spirit that animates the Nations is a neccessitated gradation, are themselves only steps in the development of the Universal Spirit." ২৫

এই পাশ্চাত্য ইতিহাস দর্শনের আলোকেই রোমান্টিক ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস দর্শন আলোকিত বলে মনে করা অসঙ্গত হবেনা। ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তিনিও ভারত ইতিহাসে দেখেছেন

ক। এক মহৎ সামাজিক ও ঐক্য।

খ। বিশ্বমানবের মহৎ লক্ষ্যের—মহান ঐক্যের দিকে যাত্রা।

গ। ইতিহাসের মধ্যে পরম সত্তার প্রকাশ।

তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই দেখা যাবে যে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে ওপরের তিনটি উপলব্ধিতে।

"কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্তে, কত পীড়নের মন্থন, এদেশের সিংহদ্বারে কত বড়ো বড়ো রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে···ভারতবর্ষের যে পরম মূর্তিকে সমস্ত কঠোর দুঃখ ও সংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সন্ধানানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে···তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব।" "একটি অতিবৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে।" ২৬

"মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্তা, সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব···সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্য রক্ষার বিনি সেতু ইহারই নাম সত্য।" ২৭

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনায় যে রোমান্টিক ভাববাদী প্রত্যয়ের আলোচনা করা হল—তা অসম্পূর্ণ থাকে তাঁর শেষ বয়সে এই প্রত্যয়ের পরিবর্তনের যে আভাস দেখা গিয়েছিল তার উল্লেখ না করলে। পরিণত বয়সে বস্তুবিকাশের অধ্যয়ন, বিশ্ব পরিক্রমা, য়ুরোপীয় ধনবাদী সভ্যতার মেকি মানবতার অন্তঃসার-শূন্যতার অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে নতুন মোড় ফেরার সূচনা করছিল। পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানের বা সমাজতন্ত্র সমর্থক অর্থনীতি-দর্শনের সঙ্গে তাঁর কতটা পরিচয় ছিল তা আমাদের জানা নেই। উত্তরায়ণে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে বা ব্যবহৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে এমন কোন বই খুঁজে পাইনি। তবে ১৩৩৩ সাল থেকেই (অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রীঃ) কবির কিছু কিছু লেখায় এই ইতিহাস দর্শনে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

১৩৩৩ সালে তিনি লিখছেন, "য়ুরোপে··· মানুষ সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম, সিণ্ডি-ক্যালিজম প্রভৃতি নানা প্রকারের সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে।"২৮

১৩৩৪ সালে লিখছেন, "মানুষের ইতি-হাসে একদিকে রাজশক্তি অন্যদিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে।"

"যেখানে দুর্বল ও সবলের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডেমোক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে।"২৯

"···এক্সপ্লয়টেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি—বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই।"৩০

১৩৩৭ সালে (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০-এ মস্কো থেকে লেখা চিঠিতে। "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অনাত্ম লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি। তাদেরই বাহন: তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্প্র-দায়ের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।"৩১

প্রথম জীবনে যে ভাববাদী দৃষ্টিতে ভারত ইতিহাসে এক সার্বিক ঐক্যের সুষমা কবির উপলব্ধিতে ছিল—তা যে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার পরিচয় 'নবজাতকে'র 'হিন্দুস্থান' কবিতায়:

নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিক বাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি আনেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।

প্রাচীন প্রাচীর পর অকস্মাৎ করেছে লঙ্ঘন
হুহুংকার
অর্ধরাত্রে যার জেগে জাগিয়াছে আত
কোলাহল।
করেছে আসব ভাড়াভাড়ি
ভূধিতের অন্নথালি দিয়েছে উল্টায়ি।
নীতির পীড়নকারী চোরে দিলি লাঞ্ছনা
কালের
যেখানে প্রচিন্নাছিল দূরে যেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একবারে বিরাট কবর
প্রাস্ত হতে প্রাস্তে প্রসারিত।"

'ভূধিতের অন্নথালি' উল্টান করার আর পীড়িতের ওপর পীড়নকারীর অন্যায় ধ্বংসাত্মক চিরকালই কবির কাছে ভারত ইতিহাসের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ দুটি ছত্রে ভারত ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ না, কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে প্রথম যুগের অবাধিত আশাবাদ ও আবেগ এখানে অনুপস্থিত।

এই কবিতাটি লেখার চার বছর পরে লেখা 'আফ্রিকা' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতাটিতে কবি সুদূর অতীতকাল থেকে প্রবাহিত রাজ্য-সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসকে দেখেছেন—"মহাসূত্রের পরে ছায়া-আঁকা ছবি" রূপে। তাঁর কাছে এখন বাস্তব, অর্থপূর্ণ ইতিহাস-সত্য হ'ল যুগযুগ প্রবাহিত অন্নহীনী মানুষের জীবনধারা :

"শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ 'পরে
ওরা কাজ করে।"

দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা বস্তুবাদের আলোকে ইতিহাস বিশ্লেষণের পাশ্চাত্য ধারা তাঁর অবীত ছিল কিনা জানা যায় না। তবে সবশেষে উল্লিখিত কবিতায় ইতিহাস দৃষ্টি যে নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে—তা দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন লেখে "People's History" রচনার দৃষ্টিভঙ্গীর সমধর্মী। আর পূর্বে উল্লিখিত 'হিন্দুস্থান' কবিতায় ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী—যাদের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের পথিকৃৎ মার্কসের বক্তব্যের প্রায় নিকটবর্তী। ভারত ইতিহাসের তথাকথিত স্বর্ণযুগ বা পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করেছেন মার্কস—

"I share not the opinion of those who believe in a golden age of Hindusthan…"৩০

বিদেশী আক্রমণ ভারতে বহুবার হয়েছে। এমন আক্রমণ ও পরাজয় গ্রীস ও ইটালীর ভাগ্যেও ঘটেছে। কিন্তু অন্য কোন দেশের মানুষ এমন সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। রাজনৈতিক ইতিহাসে আমাদের গর্বিত হবার কিছু খুবই সীমাবদ্ধ। বস্তুবাদী মার্কস তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতীয় গ্রাম সমাজের নিষ্ক্রিয়, গতিহীন মানুষের ওপর জোর দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্ব-ভারতীয় ঐক্যচেতনা কখনও দেখা যায়নি। যার ফলে সাধারণ ভারতবাসী "had quietly witnessed the ruin of empires.৩১

মূলত জার্মান ও ফরাসী আইতিহাসিক ইতিহাস দর্শনের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা গড়ে উঠলেও জীবনসন্ধ্যায় তিনি যে নতুন পথ খুঁজছিলেন সেটা উল্লেখ-যোগ্য। আর এই সঙ্গে এটুকুও বলা যায় যে সমকালীন বিশ্ব-রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাতের প্রধান দুটি দিক—সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শোষিতদের মধ্যে স্বত্ব এবং ধনবাদের ক্ষেত্রের শোষণ ও শোষিতদের স্বত্ব তাঁর কাছে ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠছিল—যার প্রমাণ ও কবিতায় তিনি তা প্রকাশ করেছেন।৩২ এটা কবির সমকালীন ইতিহাস চেতনার নতুন পরিণতির পরিচায়ক।

পাদটীকা

১। রবীন্দ্র রচনাবলী : জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ ॥ ১৩শ খণ্ড ॥ পৃ: ৪৫০

২। তদেব পৃ: ৪৫১-৫২

৩। তদেব পৃ: ৪৫২

৪। রবীন্দ্রনাথের পীড়িত—পাদটীকা '২১' দ্রঃ

৫। B. B. Mazumdar : History of Political Thought From Rammohan to Dayananda. P. 294.

৬। বঙ্গদর্শন ॥ পৌষ ॥ ১২৮৭

৭। বঙ্কিম জাতিবৈশিষ্ট্য গড় ethnological শ্রেণীবিভাগ এ 'বাঙালী মুসলমান' বলে একটি জাতি শ্রেণীর উল্লেখ করে তত্ত্বের প্রবর্তন করেছেন।

৮। বিবিধ প্রবন্ধ ॥ বাঙ্গালার উৎপত্তি : সপ্তম পরিচ্ছেদ, "মুল কথা"।

৯। Letters on Hinduism : Bankim Rachanavali (English Works) Ed. by J. C. Bagal P. 231

১। "The regular archaeological exploration commenced by the government in 1861 and the writings of a notable band of Indologists, mostly Europeans, evoked in the minds of the Indians a very vivid picture of the glory and greatness of ancient India."
[Dr. R. C. Mazumder : "The National Movement" in History of Bengal. Ed by V. K. Sinha P. 198

১০। জন্মশত: রবীন্দ্র রচনাবলী ॥ ১২শ খণ্ড ॥ পৃ: ৩৭৭

১১। জন্মশত: রবীন্দ্র রচনাবলী ॥ ১২শ খণ্ড ॥ পৃ: ৩৭৮ ॥

১২। "Philosophical Dialogues and Fragments From The French of Ernest Renan : Translated with sanction of the author by Ras-Bihari Mukherjee. London. 1880 P. 50

১৩। Ibid. P. 51

১৪। Ibid P 59

১৫। Guizot : History of Civilization of Europe. Vol 1 P. 2

১৬। Ibid P. 5

১৭। Ibid P. 22

১৮। Ibid P. 24

১৯। Ibid P. 27

২০। H. W. Wardman : Life of Renan P. 44

২১। 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থ: পরিশিষ্ট : পত্র: র: র:। ১২৭। পৃ: ১০৬

২২। H. Wardman op. cit. P. 47

২৩। R. G. Collingwood : Idea of History. P. 112

২৪। "...as a continuous development where man freely works out the purposes of the Absolute..." (Ibid P. 112)

২৫। Hegel : Lectures on the Philosophy of History, Tr, J. B. Sibree p. 82

২৬। 'পথ ও পাথেয়' : রাজা প্রজা : পত্র র: র:। ১২৭। পৃ: ৯৯০

২৭। তদেব পৃ: ৯৯১

২৮। কালান্তর। পত্র র: র:। ১৩৭। পৃ: ৩৪৫।

২৮ক। তদেব পৃ: ৪২৯

২৯। তদেব পৃ: ৪১৫

৩০। K. Marx : British Rule in India [Marx-Engels Selected Works Vol 1 P. 345

৩১। Ibid P. 350

৩২। 'পত্রপুটে'র ১২ সংখ্যক কবিতা ; 'প্রান্তিক' গ্রন্থ ১৭, ১৮ সংখ্যক কবিতা, 'সৌজন্যে' 'জন্মদিন', 'নবজাতক' গ্রন্থের প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক, পত্রীবানর, আহ্বান এবং জন্মদিনের ১৬, ২১, ২২ সংখ্যক কবিতা ইত্যাদি।

—মিশ্র অর্থনীতির দেশে

এখনও

আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা মূলতঃ একচেটিয়া মালিকদের হাতে কালোবাজারী, মজুতদারী আর অতিমুনাফাখোরী আমাদের অর্থনীতিকে প্রায়নিয়ত বিপর্যস্ত করছে।

অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের ব্যয়হীন মূল্যবৃদ্ধি জাতীয় জীবনে ভয়ংকর সঙ্কট আনছে

তবু

এই শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যেও 'ক্রেতাসমবায়' আন্দোলন ক্রেতাদের করে জনসাধারণ পারেন নিজেদের কিছু সুরাহা করতে। ক্রেতাসমবায় আন্দোলনে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের পাশে আমরাও রয়েছি

প্রশাসকমণ্ডলীর পক্ষে

শ্রীভবানী চট্টোপাধ্যায়

এম এল এ

চেয়ারম্যান, প: ব: রাজ্য ক্রেতা

সমবায় ফেডারেশন লি:

পি-১, হাইড লেন

আকবর মানসন

কলিকাতা

বাংলা চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রে প্রেম অপ্রেম, মিলন বিরহ, ভাব উচ্ছ্বাস ও কল্পনা বিলাসকে বিষয়-বস্তু করে প্রচলিত ছকের প্রকরণে যে-তরঙ্গ প্রবহমান হয়ে এসেছে, তার একটা ছিন্ন অতিযাত্রাকেই বলা যায় 'নবতরঙ্গ', যেখানে বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা বস্তুমুখী চিন্তাভাবনার কালের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটে ওঠে নবারীতির প্রকাশ আঙ্গিকে। আজকের বাংলা ছবিতে যে নতুন ঢেউ লেগেছে, তার শুরুও শুরু হয়েছিল যথার্থ অর্থেই সেই ১৯৫৮ সালে মিঠু বিশ্বাসের শতাব্দাকালে নির্মিত ও প্রদর্শিত, বহুপ্রশংসিত 'অধিকার' ছবিটির মাধ্যমে। প্রবীণ আদালতে আগে সওয়াল পাল্টানোর আয়োজন যেমন করতে হয়, ঠিক তেমনি সেকালের ভীরুতা চলচ্চিত্রকার প্রবেশ বড়ো সতর্কগতিকতার বেড়া ভেঙে। সেই প্রশ্ন কি আঙ্গিকে আর কি বিষয়বস্তুতে বাস্তব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। নির্মলের মনের অধিকার ও ধনীর মর্যাদার অধিকার নিয়ে একটি ছবি সেই ত্রিশ দশকে যে সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টি করেছিল মননবিতায় তা ছিল অভিনব। সমস্যার সমাধান যে ভাবে করা হয়েছে, ছিতাবস্থা বজায় রাখার সেই সরলীকরণ, আজকে অবশ্যই সমর্থন করা যায় না,—কিন্তু সেই যুগে সমস্যার উপস্থাপনে যতটুকু বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তা দর্শকের উদ্রেকের দাবী রাখে। মনে রাখতে হবে, এ ছবিকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছিল সে কালের রক্ষণশীলদের তীব্র প্রতিক্রিয়া। ধনীর আভিজাত্যকে ক্ষিপ্ত করতে ও প্রাসাদের অহংকারকে লাঞ্ছিত করতে যেমন দেখেছি বস্তীর ক্ষুব্ধ প্রতারিত নায়কে, তেমনি সম্পদশালীর শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েই যে শ্রমিক বস্তীবাসী অশিক্ষা ও হীনম্মন্যতার কবলে পড়ে—বক্তব্য হিসেবে তাও তুলে ধরেছে 'অধিকার' ছবিটি বুদ্ধিদীপ্ত আঙ্গিকে ও সংলাপে।

পরবর্তীকালে নীতিন বসুর 'বেদের মেয়ে' ছবির কৃষি সমস্যা ও গ্রামীণ সংস্কার, বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবির দেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ নায়িকার প্রাসাদ বিলাস থেকে নেমে নায়কের পথের সাথী হওয়ার প্রেরণা, দেবকী বসুর 'পরিচয়' ছবির ধনি অঞ্চলের বাস্তব সমস্যা, নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবির উদ্বাস্তু জীবনের কান্না, নীরেন লাহিড়ীর 'কালীকাল' ছবির গ্রামীণ সংস্কৃতির মানো-য়য়ন, সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' ছবির বাস্তু হারানোর যন্ত্রণা, সুধীর মুখার্জীর 'বাঁশের কেল্লা' ছবির ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সংগ্রাম, সুনীল বসুরায়ের 'সংহারা' ছবির বন্দিতের মর্মযাতনা—বাংলা ছবির জগতে নিঃসন্দেহে নতুন হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল, কারণ বিষয়বস্তুর এরকম ঘ্রাণ ও স্বর্গ অন্যান্য বাংলা ছবিতে তখন ছিল দুর্লভ, - সুলভ যা ছিল, তা হল প্রেম ও বিচ্ছেদের ঘরোয়া নাটক, জীবনের চোরাগলি ও কানাগলির পরিবর্তে কল্পনা রঙীন রাজপথ—সেখানে মাঝে মধ্যে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, অবাস্তবতার হাতছানি।

১৯৫২ সালে ঋত্বিক ঘটক ছবি করলেন 'নাগরিক'। নগর জীবনের জটিলতা ও যন্ত্রণা সেখানে বস্তুনিষ্ঠতায় বিধৃত। ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' এলো—সেখানে দেখা গেল গ্রাম-বাংলার বেদনা-জীর্ণ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কাব্যিক মেজাজে, ও ছন্দ সুষমায়। অতঃপর সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'জলসাঘর', 'চারুলতা' প্রভৃতি এবং ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'কোমল গান্ধার', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'—বাংলা ছবিতে জোয়ার এনেছে নিঃসন্দেহে। মৃণাল সেনের ছবিতে রাজনৈতিক চেতনা অসতীর্ণ হলেও শুরুর আরোপ করেছে। তাঁর 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা-৭১', 'পদাতিক', 'কোরাস' ইত্যাদি ছবি বিষয় ও আঙ্গিকে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছে, সন্দেহ নেই। তাঁর 'পরশুরাম' ব্যর্থ। 'একদিন প্রতিদিন' ছবি বিষয় বহিস্থায় নয়, নি: কৃতিত্বে অবশ্য উজ্জ্বল। 'আকাশের সন্তানে' ও 'চালচিত্র' তাঁর যুক্তি প্রতীক্ষিত দুটি ছবি। রাজেন তরফদারের 'অন্তরীক্ষ', 'সঙ্গ', অমিত সেনের 'চলাচল', 'পঙ্কতপা', তপন সিংহের 'অঙ্কুর', 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'হাঙ্গুলী বাঁকের উপকথা', 'নির্জন সৈকতে', 'অতিথি', 'জতুগৃহ', 'সাগিনা মাহাতো', 'রাজা' প্রভৃতি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রচ লিত ছকের বাইরে তোলা হয়েছে, স্বীকার করতে বুঝা থাকার কথা নয়। বাঙ্গীন সাহা. 'তের নদীর পারে', হরিসাধন দাশগুপ্তর 'এক অঙ্কে এত রূপ', অরুণ গুহ ঠাকুরতার 'বেনারসী', বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্র-বর্তীর 'দিবারাত্রির কাব্য', উৎপল দত্তর 'মুক্ত তারার গান', হেমেন গুপ্তর 'বিয়াল্লিশ' ও

'ঝুলি নাই' প্রভৃতি ছবি ছিল স্বাদে ব্যতিক্রম। রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ' আজো মুক্তি পায় নি। উৎপল দত্তর 'বৈশাখী মেঘ' মুক্তি পেয়েছে এবং অভিনন্দনও লাভ করেছে। অগ্নিগর্ভের ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও তার নিপুণ চলচ্চিত্রায়ণ ছবিটিকে বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে।

বাংলা ছবির নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছবিকে নবতরীতির প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে, অস্বীকার করার নয়। বাংলার নিউ থিয়েটার্স শিল্পসুষমা, সুস্থ ছবি তৈরী করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তারই অনুপ্রেরণায় বোম্বে টকীজের পত্তন সম্ভব হয়েছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু ও নীতিন বসুর সমান্তরাল সচেতন দৃষ্টিভংগী উৎসাহিত করেছিল তি শান্তারামকে প্রথাবিরুদ্ধ বিষয়ের ছবি তুলতে। আজ ভারতবাসীকে বিষয় করে তামিল ও কানাড়ী ছবিগুলি যে দৃষ্টিনন্দন তুলেছে, তার সূচনা করেছিল এই বাংলারই ছবি—১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস'।

সুস্থ, জীবননিষ্ঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত ছবির সংখ্যা কোন দেশেই কখনো বৃদ্ধি হয় না—বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। বেশীর ভাগ ছবিই হয় ব্যবসাদারী মনোভাব নিয়ে—দর্শকের তাৎক্ষণিক মনোরঞ্জনের খাতিরে জীবনদৃষ্টি কল্পনার রঙীন কানুন ঝুলিয়ে ও বাঁধা ছকে মুনাফা লাভের নিশ্চয়তার পথ ধরে। শিল্পনিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা পরীক্ষা নিরীক্ষা আর জীবন জিজ্ঞাসা সেখানে পুরোপুরি অহেতুক, তাই একেবারে বেপাত্তা। তবু আগাছার জঙ্গলেও গাছে ফুল ফোটে—অধিকিংকর ব্যবসায়িক ছবির ভিড়েও দেখা যায় প্রথাবিরোধী শিল্পরুচির ছবি—সংখ্যায় যতই কম হোক—পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না—প্রেরণা ছড়িয়ে বেঁচে থাকে। কুঁকি বেশী সেখানে—কি নির্মাণে আর কি মুক্তিতে—তবু পেছপা নয়—উৎসাহে ভাটা পড়ে না—এরা সাহসী, বিদ্রোহী—এদের তারুণ্যের তেজেই বাংলা ছবিতে আজও নতুন জোয়ার লাগে।

পূর্ণেন্দু পত্রী 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবি করলেন। চোখে তাঁর নতুন স্বপ্ন—সে স্বপ্ন ভেঙে গেল বাস্তবের কঠিন স্পর্শে। তবু স্বপ্ন দেখাটা নিষ্ফল ছিল না—নতুন কিছু করার আগ্রহে ভাটা ছিল না। অভাব ছিল অভিজ্ঞতার—পরিণত ভাবনার। এমনটি তো কত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে—কখনো তা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়েছে, কখনো হয়েছে সার্থক। তবু চলছে ও চলবে—কখনো হতাশার গাঢ় অন্ধকারে নেমে আসে, কখনো আশার আলো উদ্ভাসিত করে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে।

পরবর্তীকালে পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালনা করলেন 'স্ত্রীর পত্র' ও 'ছেঁড়া তমসুক'। 'স্ত্রীর পত্র'র আঙ্গিক প্রশংসিত হল। 'ছেঁড়া তমসুক'ও দৃষ্টি আকর্ষণ করল চিত্রমহলের। তাঁর 'মালঞ্চ' ছবি এখনো মুক্তি পায় নি। ছবি মুক্তির সমস্যায় আজ অনেক নবাগত চলচ্চিত্রকার অধীর এবং শঙ্কিত।

দীর্ঘদিন তথাকথিত ব্যবসায়িক ছবির বাঁধা ছকে নির্মিত জীবন বিমুখ অপদার্থ ছবির প্রাচুর্যে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প দুঃসহ রক্তশূন্যতায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। আগেও মাঝে মধ্যেই এমনটা হয়েছিল, কিন্তু পরে পরেই কিছুদিনের জন্য একটা শুভ-পরিবর্তনও দেখা গিয়েছিল। এবারও দেখা গেল পালাবদল। নতুন আশার আলো—নতুন রক্তসঞ্চারের সঞ্জীবনী শক্তি। সত্তর দশকে একদল তরুণ নবাচিন্তা ও নবতরীতির বাহক হয়ে হাজির হলেন বাংলা ছবির আঙিনায়। তাঁদের চোখে আগামী দিনের উজ্জ্বল স্বপ্ন আর মনে নতুন কিছু করার অদম্য সাহস। অস্থির সময় আর দোলাচল রাজনীতির আবর্তে থেকেই উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, সৌম্যেন্দু রায়, শংকর ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সৈকত ভট্টাচার্য, বিপ্লব রায়চৌধুরী, নীতিশ মুখার্জী প্রমুখ তরুণ চলচ্চিত্রকার বিপুল উৎসাহে বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার এনে দিতে ব্রতী হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের আর্থিক সহযোগিতাও বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। তবু আর্থিক অনুদানই নয়—ছবির প্রযোজনায় এগিয়ে এসেছে আজ রাজ্য সরকার। বিভূতিভূষণ ব্যানার্জীর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি সমাজ সচেতন বলিষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ দিলেন এঁদেরই তিন নবতরীতির পরিচালক। পূর্ণেন্দু পত্রী তুলছেন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। সৈকত ভট্টাচার্য ব্যস্ত আছেন 'যাকে যুগ দিতে হয়' রূপ দিতে আর জোছন দস্তিদারের পরিচালনায় উঠছে 'প্রাগৈতিহাসিক'। সরকারী প্রযোজনায় এই তিনটি ছবির নির্মাণ সম্পর্কে রীতিমত আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী এ যাবৎ পর্দায় বিশেষ আদর পায় নি। সেকালে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় তুলেছিলেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা'—সেটি ছিল অক্ষম প্রয়াস। 'দিবারাত্রির কাব্য' অবশ্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। 'নেতী' গল্প অবলম্বনে 'যাত্রী' তুলেছিলেন অগ্রগামী গোষ্ঠী—নামও করেছিলেন। আর মর্যাদা পেয়েছিল মৃণাল সেন কৃত 'কলকাতা ৭১' ছবির অন্তর্গত অন্যতম খণ্ডচিত্র 'আত্মহত্যার অধিকার।'

একাধিক ছবি করে পূর্ণেন্দু পত্রী আগেই সুনাম অর্জন করেছেন—এবার 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' পরিচালনায় তাঁর ক্ষমতার নতুন পরিচয় পাবার কৌতূহল থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তরুণ পরিচালক সৈকত ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে একটি মাত্র ছবি করেছেন 'অবতার'। সে ছবিতে তিনি প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সমাজের শাসন ব্যবস্থায় অন্তঃসারশূন্যতা আর ভণ্ডামি কেমন করে

প্রশ্রয় পেয়ে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে—তাই রেবাদ্বক রূপ ফুটেছে 'অবতার' ছবিটিতে। আবেদন সকারে ব্যর্থতা ছিল সেখানে, কিন্তু প্রয়াসে ছিলনা নিষ্ঠার অভাব। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' কাহিনীর রূপায়ণে এবার তিনি কতখানি কৃতকার্য হন, সেটাই দেখবার। যোগেন বন্দিতার মত জগতের লোক—এবার এনেছেন ছবি করতে। তাঁর হাতে 'প্রাগৈতিহাসিক' কেমন রূপ নেয়, তাহাতে তা লক্ষ্য করবার বিষয়।—এই প্রসঙ্গে এক ফোডের কথা বলি। যাঁর হাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর যথাযথরূপায় রূপায়ণ সম্ভব হত বলে ঐকান্তিক বিশ্বাস রাখি, সেই ঋত্বিক ঘটক কিন্তু জীবনে মানিক-কাহিনী অবলম্বনে একটি ছবিও করলেন না এবং কেন যে করলেন না, তাও ঠিক জানা গেল না!

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'দূরত্ব' ও 'নিমন্ত্রণপূর্ণী' কি আংগিকে আর কি বিষয়বস্তুতে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছে। রেখেছে কিন্তু বলিষ্ঠতার স্বাক্ষরও। প্রেম ও স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এবং নারীর অবস্থান এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক বেশে কোন মূল্যবোধে নিয়ন্ত্রিত হয়, তার রাজনৈতিক কিন্তু বিশ্লেষণ 'দূরত্ব'কে বিশিষ্ট করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন সার্থক করে তুলতে পারেনি। 'নিমন্ত্রণপূর্ণী'র দৃশ্য ব্যঞ্জনা ও বাস্তবতা প্রশংসনীয়, বক্তব্য উপস্থাপনের তাৎপর্যময়তাও লক্ষ্যণীয় এবং সেই সংগে আবেদন সকারের অক্ষমতাও উল্লেখ করতে হয়। ছবিটি আজও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তিলাভ করে নি।

শংকর ভট্টাচার্য 'শেষ রক্ষা' ছবিতে সত্যিই শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ছবিটিতে ছিল না সেই লাবণ্যের ছাপ, যা আকর্ষণীয় করে তোলে। কিন্তু পরবর্তী 'হৌড' ছবিতে তিনি দুরন্ত ক্ষমতায় এগিয়ে সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন—যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'হৌড' বাংলা ছবিতে যে দুরন্তগতির সঞ্চার করেছে, তা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকা হীনমন্যতায় জর্জরিত 'জনমরণা'কে শুধু বিস্তারই দেয়। শংকর ভট্টাচার্যর আসামী ছবি 'অবমেধের ঘোড়া' 'বিত্ত সাফল্যে উত্তীর্ণ হবে বলেই বিশ্বাস রাখি।

বিদ্রোহী তরুণ উৎপলেন্দু চক্রবর্তী স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রথম তথাচিত্র 'মুক্তি চাই'-র মধ্য দিয়ে অনেক প্রত্যাশা জাগিয়েছেন। তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র 'বরনা তরঙ্গ' এখনো মুক্তি পায় নি, তবে পুরস্কৃত হয়েছে। প্রকাশ, গ্রাম্য পটভূমিতে আদিবাসীদের নিয়ে ছবিটি তোলা হয়েছে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগীতে। স্বরচিত কাহিনী 'চোখ' অবলম্বনে শরৎ পটভূমিকায় ও নতুন ভংগীতে তিনি পরের ছবিটি করবেন বলে জানা গেছে।

তরুণ নীতিশ মুখার্জীর প্রথম ছবি 'একদিন পূর্ব' পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে রসে উত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। ছবিটিতে কিছু উত্তাপ ও 'সিমিক' পীড়াদায়ক হলেও নতুন ভাবনার ছাপ অলক্ষ্যে থাকেনা। তাঁর পরের ছবি 'রবিবার' এখনো মুক্তি পায়-নি। আশা করা যায়, এ ছবিতে তিনি নতুনত্বের স্বাদ এনে আবেদন সকারে সাফল্য লাভ করবেন।

রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় 'টু ইন ওয়ান' পর্যায়ে দুটি ছবি করছেন দুই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ চলচ্চিত্রকার। গৌতম ঘোষ অমিত উৎসাহে তুলছেন 'দখল' ছবি আর বিনয় রায়-চৌধুরী 'বসাপৃথিবী'। বিনয়চৌধুরীর ছবি 'বর্ষ বিবর্ষ' আজও মুক্তিলাভ করেনি। এরাই আরও কতজনের কত ছবি মুক্তির আলোয় প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। কে বলতে পারে, সেগুলির মধ্যেই হয়তো কোন কোনটি ভবিষ্যতের দিগ্‌ নির্দেশক উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা তুলে ধরার ক্ষমতা রাখতে পারে। কিন্তু ছবি মুক্তির বাধা না দূর করতে পারলে তার আশা ভরসা আর থাকে কোথায়? একথা তো ঠিকই যে, ছবি নিয়ে প্রকরণগত ও বিষয়গত যত পরীক্ষা নিরীক্ষাই হোক, চলচ্চিত্রায়ণে রস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আবেদন সঞ্চার করতে না পারলে ছবি কখনও দর্শক নেবে না,—আবার একথাও তো নির্মম সত্য যে, ছবি মুক্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে সৎ উদ্যোগও মাঠে মারা যাবে।

সমাজ সচেতন, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান তরুণের দল নতুন প্রেরণা নিয়ে বাংলা ছবি করতে এগিয়ে এসেছেন—তত্ত্ব লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, এঁদের মধ্যে পারস্পরিক কোন যোগাযোগ নেই, নেই কোন ভাবনার্য, নেই সাংগঠনিক ঐক্য। সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন—একক শক্তি ও প্রচেষ্টায় সক্রিয়। বর্তমান গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যে যেমন একতা আছে—কেডারেশনের শৃঙ্খলা আছে, সম্মিলিত সংগ্রামের শপথ-নিষ্ঠা আছে, তেমনটি আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে থাকবে না কেন? গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মত আধুনিক সংছবির আন্দোলন নেই কেন? শুধু কথায় কথা 'আন্দোলন' হামেশাই উচ্চারিত হয়ে থাকে—কিন্তু সেই আন্দোলনের শরিক ক'জন চিত্র-নির্মাতা? অতি সম্প্রতি 'কোরাস কর বেটার সিনেমা' নামে এক সংস্থার জন্ম হয়েছে। আশা করব, ভবিষ্যতে এই কোরাস সুস্থ শিল্পোত্তীর্ণ ছবির আন্দোলনকে সুসংগঠিত করে নবীন চলচ্চিত্রকারদের সংঘবদ্ধ করে তুলবে এবং ছবি মুক্তির সমস্যারও মোকাবিলা করবে।

সম্পাদক—বীরেন বসু। সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, ৯ট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন।
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পূজোর গন্ধ।
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ।
তার উপর তুলির রঙ্গে আর ঘামে অপরূপ প্রতিমা।
তার বোধনের আর কত দেরী ?
কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা।
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা।
তার চাল-চিত্র রচনায় আমরা দিন-রাত ব্যস্ত।
বোধনের আর দেরী নেই।

medium

মেট্রো রেলওয়ে